লতাপাতা খেয়ে জীবন নির্বাহ করাকেই শ্রেয় মনে করেছেন। এর পর হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ অতএব তোমরা আল্লাহর দিকে পলায়ন কর। আমি তোমাদের জন্যে প্রকাশ্য সতর্ককারী। এর পর তিনি বলেন ঃ কিছু লোক পলায়ন করেছে। যদি আল্লাহ তাআলা নবুওয়তের মধ্যে কোন রহস্য না রাখতেন, তবে আমরা বলতাম, নবী তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। কেননা, আমরা জেনেছি, ফেরেশতারা তাদের সাথে সাক্ষাৎ ও মোসাফাহা করে এবং হিংস্র প্রাণীরা তাদের দর্শন লাভ করে বাইরে চলে যায়। তাদের কেউ হিংস্র প্রাণীকে ডাক দিলে তারা সাড়া দেয়। আর যদি জিজ্ঞেস করে, কোন্ স্থানে যাওয়ার আদেশ পেয়েছ, তবে হিংস্র প্রাণীরা তাদেরকে তা বলে দেয়। অথচ তারা নবী নয়। হযরত আবু হোরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি কোন গোনাহে উপস্থিত থাকে এবং তাকে খারাপ মনে করে, সে এমন যেন সেখানে উপস্থিত নেই। পক্ষান্তরে যে গোনাহে উপস্থিত থাকে না, কিন্তু তাকে ভাল মনে করে, সে এমন, যেন তাতে উপস্থিত রয়েছে। হাদীসের অর্থ হচ্ছে, কোন প্রয়োজনে গোনাহের জায়গায় উপস্থিত থাকে অথবা ঘটনাক্রমে তার সামনে গোনাহ হতে থাকে। নতুবা ইচ্ছাকৃতভাবে গোনাহের জায়গায় যাওয়া নিষিদ্ধ।

হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন– আল্লাহ প্রেরিত প্রত্যেক নবীর সহচর হয়েছে। তারা আপন আপন সম্প্রদায়ে থেকে আল্লাহ তা'আলার যতদিন ইচ্ছা, তাঁর কিতাব ও আদেশ অনুসারে কাজ করতে থাকবে। অবশেষে যখন আল্লাহ তাঁর নবীকে তুলে নেবেন, তখন সহচরেরা আল্লাহর কিতাব ও আদেশ অনুসারে এবং তাঁর নবীর সুন্নত অনুসারে আমল করতে থাকবে। যখন তারাও দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে, তখন এক সম্প্রদায় হবে, যারা মিম্বরে চড়ে এমন এমন কথা বলবে, যা তারা জানে এবং কাজ এমন করবে, যা জানে না। এরূপ সম্প্রদায় দৃষ্টিগোচর হলে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা প্রত্যেক ঈমানদারের উপর ওয়াজিব হবে। যদি হাতে জেহাদ করতে সক্ষম না হও, তবে মুখে জেহাদ করবে। যদি তাও সম্ভবপর না হয়, তবে অন্তর দ্বারা জেহাদ করবে। এর পর ইসলাম নেই। হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ এক বস্তির লোকজন পাপাচারী ছিল। তাদের মধ্যে চার ব্যক্তি তাদের ক্রিয়াকর্ম খারাপ মনে করত। তাদের একজন এই অনাচারের বিরুদ্ধে তৎপর হল। সে লোকজনকে বলল, তোমাদের কুকর্ম

পরিত্যাগ কর, কিন্তু তারা তার কথা প্রত্যাখ্যান করল কুকর্ম পরিত্যাগ করল না। সে তাদেরকে মন্দ কথা বলল। জওয়াবে তারাও তাকে মন্দ বলল। অবশেষে সে তাদের সাথে যুদ্ধ করল, কিন্তু যুদ্ধে তারাই জয়ী হল। এর পর সে তাদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে আল্লাহর দরবারে আরজ করল ঃ ইলাহী, আমি তাদেরকে নিষেধ করেছি। তারা মানেনি। আমি তাদেরকে গালমন্দ করেছি, প্রত্যুত্তরে তারাও আমাকে গালমন্দ করেছে। আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি, কিন্তু তারাই জয়ী হয়েছে। এর পর সে সেখান থেকে অন্যত্র চলে গেল। এর পর দ্বিতীয় ব্যক্তি অসৎ কাজে নিষেধ করতে তৎপর হল এবং প্রথম ব্যক্তির ন্যায় সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে আল্লাহর দরবারে নালিশ করে অন্যত্র চলে গেল। এমনিভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ ব্যক্তিও তাই করল।

হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ এই চার জনের মধ্যে চতুর্থ ব্যক্তির মর্তবা সবচেয়ে কম ছিল, কিন্তু তোমাদের মধ্যে তার সমতুল্যও দুর্লভ। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, এমন জনপদও ধ্বংস হয় কি, যেখানে সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ থাকে? তিনি বললেন ঃ হাঁ। প্রশ্নকারী এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ কেননা, সৎকর্মপরায়ণরা অলসতা করে এং আল্লাহ তা'আলার নাফরমানীতে চুপ থাকে। জাবের ইবনে আবদুল্লাহর রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ আল্লাহ তা'আলা জনৈক ফেরেশতাকে আদেশ করলেন, অমুক শহরকে তার বাসিন্দাদের উপর উল্টিয়ে দাও। ফেরেশতা আরজ করল ঃ ইয়া রব, সেই শহরে আপনার অমুক বান্দা আছে, যে এক মুহূর্তও আপনার নাফরমানী করেনি। আল্লাহ বললেন ঃ তার উপর এবং সকল অধিবাসীর উপর শহরটিকে উল্টিয়ে দাও। কেননা, বস্তিবাসীদের নাফরমানী দেখে এক মুহূর্তের জন্যেও তার মুখমণ্ডল রক্তিম হয়নি। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন– একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করলেন, এক জনপদের অধিবাসীদেরকে আযাব দেয়া হল। তাদের মধ্যে আঠার হাজার লোক এমন ছিল, যাদের আমল পয়গম্বরগণের আমলের মত ছিল। লোকেরা আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, এটা কিরূপে হল? তিনি বললেন ঃ তারা আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে ক্রুদ্ধ হত না এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করত না। হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ) বর্ণনা করেন– একবার হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলেন ঃ মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করা ছাড়া আরও জেহাদ আছে

কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ, পৃথিবীতে আল্লাহ্র পথে যারা জেহাদ করে, তারা শহীদদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তারা জীবিত, রিযিকপ্রাপ্ত এবং পৃথিবীতে চলাফেরা করে। আল্লাহ তা'আলা তাদের নিয়ে ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করেন এবং জান্নাতকে তাদের জন্যে এমন সজ্জিত করেন, যেমন উম্মে সালামার জন্যে সজ্জিত হয়েছে। হযরত আবু বকর (রাঃ) আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, তারা কারা? তিনি বললেন ঃ তারা হচ্ছে যারা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করে এবং আল্লাহ্র খাতিরে শত্রুতা রাখে। অতঃপর তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, তারা শহীদদের কক্ষের উপরে থাকবে। প্রত্যেক কক্ষে তিন লক্ষ দরজা হবে। কিছু দরজা ইয়াকুত ও সবুজ পান্না নির্মিত হবে এবং প্রত্যেক দরজায় নূর থাকবে। তাদের এক ব্যক্তির বিবাহ তিন লক্ষ আলোচনা হুরের সাথে হবে। যখন সে তাদের কোন একজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে, তখন সে বলবে– তোমার মনে আছে কি যে, অমুক দিন তুমি সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করেছিলে? আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ্ (রাঃ) বলেন ঃ আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ্, শহীদগণের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে অধিক মহৎ কে? তিনি বললেন ঃ সে ব্যক্তি, যে কোন যালেম শাসনকর্তার সামনে দাঁড়িয়ে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করে এবং এ কারণে নিহত হয়। যদি যালেম শাসনকর্তা তাকে হত্যা না করে, তবে সে যতদিন জীবিত থাকবে তার আমলনামায় গোনাহ্ লেখা হবে না।

এ সম্পর্কিত মহাজন উক্তি নিম্নরূপ ঃ

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ কর। নতুবা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর কোন অত্যাচারী শাসনকর্তা চাপিয়ে দেবেন। সে তোমাদের বড়দের সম্মান করবে না এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করবে না। তোমাদের সৎলোকেরা তাকে বদদোয়া দিলে সেই বদদোয়া কবুল হবে না। তোমরা আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চেয়ে সাহায্য পাবে না। ক্ষমা প্রার্থনা করলে তোমাদেরকে ক্ষমা করা হবে না। হযরত হোযায়ফা (রাঃ)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ জীবিতদের মধ্যে মৃত কে? তিনি বললেন ঃ যে মন্দ কাজ হতে দেখে হাত লাগিয়ে তা প্রতিহত করে না, মুখে মন্দ বলে না এবং অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে না। বেলাল ইবনে সা'দ বলেন ঃ নাফরমানী যখন গোপনে করা হয়, তখন তা কেবল যে নাফরমানী করে, তারই ক্ষতি করে, কিন্তু যখন প্রকাশ্যে করা হয় এবং কেউ নিষেধ করে না, তখন

সাধারণ মানুষের ক্ষতি সাধন করে। সহল ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি নিজেকে ছাড়া অন্য কারও উপর ক্ষমতা রাখে না, সে যদি নিজের বেলায় আদেশ ও নিষেধের কর্তব্য পালন করে এবং অন্যেরা মন্দ কাজ করলে তাকে মনে-প্রাণে অপছন্দ করে, তবে এতটুকুই তার জন্যে যথেষ্ট। ফোযায়লকে কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করেন না কেন? তিনি বললেন ঃ কিছু লোক আদেশ ও নিষেধ করে কাফের হয়ে গেছে। কারণ, আদেশ ও নিষেধের প্রত্যুত্তরে তাদের উপর যে নির্যাতন করা হয়, তাতে তারা সবর করতে পারেনি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আদেশ নিষেধের রোকন ও শর্ত

প্রকাশ থাকে যে, আদেশ নিষেধের গোটা ব্যাপারটি চার ভাগে বিভক্ত ঃ (১) আদেশ ও নিষেধকারী, (২) যাকে আদেশ ও নিষেধ করা হয়, (৩) যে বিষয়ে আদেশ ও নিষেধ করা হয়; অর্থাৎ, সৎকাজ ও গোনাহ এবং (৪) স্বয়ং আদেশ ও নিষেধ। এগুলোর প্রত্যেকটির জন্যে আলাদা আলাদা রোকন ও শর্ত আছে।

আদেশ ও নিষেধকারীর শর্ত ঃ আদেশ ও নিষেধকারী হওয়ার জন্যে প্রথম শর্ত হচ্ছে "মুকাল্লাফ" (শরীয়তের বিধিবিধান পালনের যোগ্য) হওয়া; অর্থাৎ, বুদ্ধিমান ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। কেননা, যে মুকাল্লাফ নয়, তার জন্যে শরীয়তের কোন বিধান পালন করা জরুরী নয়। আমরা এখানে যেসকল শর্ত লিপিবদ্ধ করব, সেগুলো ওয়াজিব হওয়ার শর্ত, জায়েয হওয়ার নয়। কাজেই যে বালক ভালমন্দের জ্ঞান রাখে এবং প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার কাছাকাছি, সে মুকাল্লাফ না হলেও ভাল কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করা তার জন্যে জায়েয। উদাহরণতঃ সে শরাব মাটিতে ঢেলে দিতে এবং খেলাধুলার সামগ্রী ভেঙ্গে দিতে পারে। এটা করলে সে সওয়াব পাবে এবং তাকে বাধা দেয়ার অধিকার কারও নেই।

দ্বিতীয় শর্ত মুমিন মুসলমান হওয়া। কেননা, ধর্মকে সমুন্নত রাখার অপর নাম হচ্ছে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ। অতএব যে ধর্ম অস্বীকার করে এবং ধর্মের শত্রু, সে এর যোগ্য হবে কিরূপে?

তৃতীয় শর্ত "আদেল" (অর্থাৎ, কবীরা গোনাহ্ থেকে মুক্ত) হওয়া। এটা কারও কারও মতে শর্ত। তারা বলেন ঃ যে ফাসেক তথা পাপাচারী, তার জন্যে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ দুরস্ত নয়। এ

সম্পর্কে তাদের প্রথম দলীল হচ্ছে, কোরআন মজীদে সেই লোকদের প্রতি শাস্তিবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, যারা যা বলে, তদনুযায়ী কাজ করে না।

আল্লাহ বলেন ঃ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم

তোমরা কি লোকদেরকে সৎকাজের আদেশ কর এবং নিজেদেরকে বিস্মৃত হও? আরও বলা হয়েছে-

كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون -

'তোমরা যা করবে না, তা বলবে- এটা আল্লাহর কাছে খুবই অপছন্দনীয়।'

দ্বিতীয় দলীল- রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ মে'রাজের রজনীতে আমি এমন লোকদের কাছেও গিয়েছি, যাদের ঠোঁট কাঁচি দ্বারা কর্তন করা হচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের পরিচয় কি? তারা বলল ঃ আমরা ভাল কাজের আদেশ করতাম, কিন্তু নিজেরা তা করতাম না এবং অসৎ কাজ করতে নিষেধ করতাম; কিন্তু নিজেরা তা করতাম। তৃতীয় দলীল হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি এই মর্মে ওহী পাঠালেন, তুমি নিজেকে উপদেশ দাও। যখন সে উপদেশ মেনে নেয়, তখন অপরকে উপদেশ দাও। নতুবা আমার কাছে লজ্জা কর। চতুর্থ দলীল হচ্ছে, অপরকে পথ প্রদর্শন করা নিজে পথে থাকারই শাখা। এমনিভাবে অপরকে সোজা করা নিজে সোজা হওয়ার শাখা। সুতরাং যেব্যক্তি নিজে পথপ্রাপ্ত হবে না, সে অপরকে কিরূপে পথ দেখাবে?

তাদের এসব দলীল নিছক কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। সত্য হচ্ছে, যে ফাসেক, তার জন্যে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করা জায়েয। এর প্রমাণ হচ্ছে, দেখতে হবে, আদেশ ও নিষেধকারীর জন্যে সকল গোনাহ থেকে মাসুম তথা পবিত্র হওয়া শর্ত কি না? যদি বলা হয় শর্ত, তবে এটা উম্মতের এজমার বিপরীত। এছাড়া এর মানে হবে আদেশ ও নিষেধের দ্বার সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে দেয়া। কেননা, নিষ্পাপ সাহাবীগণও ছিলেন না। অন্যদের তো কথাই নেই। এ কারণেই সায়ীদ ইবনে জোবায়র (রহঃ) বলেন ঃ যদি আদেশ ও নিষেধ কেবল সেই ব্যক্তি করে, যার মধ্যে কোন গোনাহ নেই, তবে কেউ এ কর্তব্য পালন করতে পারবে না। ইমাম মালেক এ উক্তি পছন্দ করেছেন। যদি বলা হয়, সগীরা গোনাহ থেকে পবিত্র হওয়া শর্ত নয়, ফলে রেশমী বস্ত্র পরিহিত ব্যক্তির জন্যে জায়েয আছে, সে যিনা ও মদ্যপান থেকে নিষেধ করতে পারে; তা

হলে আমরা জিজ্ঞেস করব, মদ্যপায়ীর জন্যে কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা জায়েয হবে কি? যদি বলা হয়, জায়েয নয়, তবে এটা এজমার খেলাফ। কেননা, মুসলমানদের সৈন্যবাহিনীতে সর্বদাই সৎ, বীর মদ্যপায়ী, এতীমদের প্রতি অন্যায় ব্যবহারকারী সর্বপ্রকার লোক থাকত। তাদেরকে জেহাদ করতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলে হয়নি এবং পরবর্তীকালেও নিষেধ করা হয়নি। যদি বলা হয়, মদ্যপায়ীর জন্যে জেহাদ করা জায়েয, তবে আমরা প্রশ্ন করব, তার জন্যে হত্যা করতে নিষেধ করাও জায়েয হবে কি না? জায়েয না হলে আমরা বলব, তা হলে মদ্যপায়ী ও রেশমী বস্ত্র পরিধানকারীর মধ্যে পার্থক্য হওয়া উচিত যে, রেশমী বস্ত্র পরিধানকারীর জন্যে মদ্যপানে নিষেধ করা জায়েয। অথচ হত্যা, মদ্যপান এবং রেশমী বস্ত্র পরিধান একই পর্যায়ের মন্দ কাজ। এগুলোর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। যদি বলা হয়, মদ্যপায়ীর জন্যে হত্যা করতে নিষেধ করা জায়েয এবং এর কারণ হচ্ছে, যেব্যক্তি একটি গোনাহ করে, তার জন্যে এর মতই এবং এর চেয়ে নিম্নস্তরের গোনাহ থেকে নিষেধ করা জায়েয নয়; বরং সে উপরের স্তরের গোনাহ থেকে নিষেধ করতে পারে। তবে এ দাবী জবরদস্তি এবং এর কোন দলীল নেই। কেননা, এটা অসম্ভব নয় যে, মদ্যপায়ী যিনা ও হত্যা থেকে নিষেধ করবে এবং যে যিনা করে, সে মদ্যপান থেকে নিষেধ করবে; বরং এটাও অসম্ভব নয় যে, একজন নিজে মদ্যপান করবে এবং তার গোলাম ও চাকরদেরকে মদ্যপান করতে নিষেধ করবে। সে বলবে, নিষেধ মান্য করা এবং অপরকে নিষেধ করা এ দু'টি বিষয়ই আমার উপর ওয়াজিব। এখন একটি বিষয়ে যদি আমি গোনাহ করি, তবে অপরটিতেও আল্লাহর নাফরমান হওয়া আমার জন্যে কিরূপে অপরিহার্য হবে? যদি কেউ বলে, এ বক্তব্যদৃষ্টে কেউ বলতে পারে, আমার উপর ওযু ও নামায দুটি বিষয়ই ওয়াজেব, কিন্তু আমি ওযু করব, নামায পড়ব না এবং সেহরী খাব, রোযা রাখব না; তবে এর জওয়াব হচ্ছে, এতদুভয়ের মধ্যে ওযু নামাযের জন্যে ওয়াজিব, এমনিতে ওয়াজিব নয়। এমনিভাবে সেহরী খাওয়া রোযার জন্যে। রোযা না হলে সেহরী খাওয়া মোস্তাহাব হত না, কিন্তু আলোচ্য বিষয়বস্তু এরূপ নয়। এখানে অপরের সংশোধন নিজের সংশোধনের জন্যে এবং নিজের সংশোধন অপরের সংশোধনের জন্যে উদ্দেশ্য হয় না। তবে ওযু ও নামাযের ক্ষেত্রে এতটুকু বিষয়ই জরুরী হয় যে, যেব্যক্তি ওযু করে কিন্তু নামায পড়ে না, তার শাস্তি সেই ব্যক্তির তুলনায় কম হবে, যে ওযু ও নামায উভয়টি বর্জন করে। এমনিভাবে যেব্যক্তি অপরকে নিষেধ করা

এবং নিজে বিরত থাকা উভয়টি বর্জন করবে, তার শাস্তি সেই ব্যক্তির তুলনায় বেশী হবে, যে অপরকে নিষেধ করে; কিন্তু নিজে নিষেধ মানে না।

এক্ষণে যারা কোরআনের আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেন, তাদের জওয়াব হচ্ছে, আয়াতে ভাল কাজ বর্জন করার নিন্দা বর্ণিত হয়েছে– আদেশ করার নিন্দা করা হয়নি, কিন্তু আদেশ দ্বারা তাদের এলেমের জোর পাওয়া যায়। আর যে আলেম, সে সৎকাজ বর্জন করলে শাস্তি অধিক হয়। কারণ, এলেমের শক্তি থাকলে তার কোন ওযর থাকে না। এছাড়া لم تقولون ما لاتفعلون –আয়াতে মিথ্যা ওয়াদা বুঝানো হয়েছে। প্রথমে নিজেকে উপদেশ দাও– হযরত ঈসা (আঃ)-এর উদ্দেশে আল্লাহ তা'আলার এই উক্তির মধ্যে মৌখিক আদেশ ও নিষেধ করার অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এটা আমরাও স্বীকার করি, ফাসেকের মৌখিক উপদেশ তাদের জন্যে উপকারী নয় যারা তার পাপাচার সম্পর্কে অবগত আছে। এ উক্তির শেষে বলা হয়েছে– আমাকে লজ্জা কর, এ থেকেও অপরকে উপদেশ দেয়ার নিষেধাজ্ঞা বুঝা যায় না; বরং এর অর্থ হচ্ছে, অধিক জরুরী বিষয় ত্যাগ করে কম জরুরী বিষয়ের মধ্যে ব্যাপৃত হয়ো না; যেমন কথায় বলে– প্রথমে পিতার সম্মান কর, এর পর প্রতিবেশীর। নতুবা লজ্জা কর।

কারও কারও মতে চতুর্থ শর্ত হচ্ছে, আদেশ ও নিষেধের কাজ সম্পাদন করার জন্যে ইমাম তথা শাসনকর্তার পক্ষ থেক অনুমতি আবশ্যক। তারা সাধারণ লোকদের মধ্য থেকে যে কোন ব্যক্তির আদেশ ও নিষেধের অধিকার প্রমাণ করেন না, কিন্তু আমাদের মতে এ শর্তটি ঠিক নয়, বরং অনিষ্টকর। কেননা, আমরা যেসকল আয়াত ও হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি, সেগুলো থেকে জানা যায়, যেব্যক্তি কুকর্ম হতে দেখে চুপ করে থাকবে, সে গোনাহগার হবে। কেননা, যেখানেই দেখুক, অসৎ কাজ করতে নিষেধ করা তার উপর ওয়াজিব। আশ্চর্যের বিষয়, রাফেযী সম্প্রদায় আরও বাড়াবাড়ি করে বলে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ জায়েযই নয় যে পর্যন্ত নিষ্পাপ ইমাম আত্মপ্রকাশ না করেন। তাদের মতে নিষ্পাপ ইমাম আত্মগোপন করে আছেন। এ সম্প্রদায় আলোচনা করারই যোগ্য নয়।

তবে আদেশ ও নিষেধের একটি বিশেষ স্তর আছে, যাতে ভীতি প্রদর্শন, হুমকি প্রদর্শন অর্থাৎ মারপিট করা হয়। এতে উভয় পক্ষে

খুনাখুনির উপক্রম হতে পারে বিধায় এই স্তরে শাসনকর্তার অনুমতি নিয়ে আদেশ ও নিষেধ করা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে যথাস্থানে আরও আলোচনা করা হবে।

কোন ফাসেককে মূর্খ, নির্বোধ, বদকার ইত্যাদি বলে সতর্ক করা সত্য কথা বলারই নামান্তর। সত্য কথার দাবী হচ্ছে, তা নির্দ্বিধায় বলতে হবে। বরং হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী যালেম শাসনকর্তার মুখের উপর সত্য কথা বলা সর্বোত্তম স্তর। অতএব যেখানে শাসনকর্তার সামনে সত্য বলার নির্দেশ রয়েছে, সেখানে শাসনকর্তার অনুমতির প্রয়োজন কিরূপে হবে? পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ সর্বদাই যালেম শাসনকর্তার সামনে সত্য প্রকাশ করে গেছেন। এটাও এ বিষয়ের দলীল এবং অকাট্য এজমা যে, এক্ষেত্রে শাসনকর্তার অনুমতি আবশ্যক নয়। সেমতে বর্ণিত আছে, মারওয়ান ইবনে হাকাম ঈদের নামাযের পূর্বে খোতবা পাঠ করলে এক ব্যক্তি বলে উঠল ঃ খোতবা তো নামাযের পরে হয়। মারওয়ান ক্রুদ্ধ হয়ে বলল ঃ আমি তোমাকে বুঝে নেব। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বললেন ঃ সে যে বিষয়ে আদিষ্ট ছিল, তা বলে দিয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাদেরকে বলেছেন ঃ যেব্যক্তি কোন মন্দ কাজ দেখে, সে যেন তাকে মন্দ মনে করে। এটা দুর্বলতম ঈমান। সুতরাং পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এই আদেশ থেকে এটাই বুঝেছিলেন যে, শাসকবর্গও এতে দাখিল। এমতাবস্থায় তাদের অনুমতি নেয়ার অর্থ কি? বর্ণিত আছে, খলীফা মহেদী মক্কা মোয়াযযমায় আগমন করে কিছুদিন অবস্থান করেন। এর পর যখন তিনি তওয়াফ করতে যান, তখন লোকজনকে কা'বা গৃহের আশপাশ থেকে সরিয়ে দিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মরযুক লাফিয়ে উঠে তার জামার কলার ধরে ঝাঁকানি দিলেন এবং বললেন ঃ দেখ, তুমি কি করছ! তোমাকে এ গৃহের অধিক হকদার কে বানিয়েছে যে, দূর অথবা নিকট থেকে যে এ গৃহে আসবে, তুমি তাকে বাধা দেবে? অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ سَوَاءً نِ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادُ –এ গৃহে স্থানীয় বহিরাগত সকলেই সমান।

খলীফা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এর পর তাঁকে গ্রেফতার করে বাগদাদে নিয়ে এলেন, কিন্তু এমন শাস্তি দেয়া ভাল মনে করলেন না, যাতে জনগণের মধ্যে তাঁর অবমাননা হয়। তাই তাঁকে ঘোড়ার আস্তাবলে বন্ধ করে দিলেন, যাতে তিনি ঘোড়ার পদাঘাতে নিষ্পেষিত হয়ে যান। মানুষকে কামড় দেয়, এমন একটি ঘোড়া তাঁর নিকটে রেখে দেয়া হল, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ঘোড়াটিকে তাঁর বশীভূত

করে দিলেন। ফলে তিনি কোন প্রকার কষ্ট পেলেন না। এর পর খলীফা থাকে একটি কক্ষে বন্ধ করে চাবি নিজের হাতে রেখে দিলেন। তিন দিন পর তিনি কক্ষ থেকে বের হয়ে বাগানে প্রবেশ করলেন এবং লতাপাতা খেতে লাগলেন। খবর পেয়ে খলীফা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে বের করেছে? তিনি বললেন ঃ যে আমাকে বন্ধ করেছিল। খলীফা শুধালেন ঃ কে বন্ধ করেছিল? তিনি বললেন ঃ যে আমাকে বের করেছে। খলীফা বিচলিত হয়ে ক্রোধে গর্জন করে বললেন ঃ তোমার কি ভয় নেই? আমি তোমাকে মেরে ফেলব। তিনি মাথা তুলে বললেন ঃ যদি মউত ও হায়াত তোমার করায়ত্ত হত, তবে অবশ্যই আমি ভয় করতাম। শেষ পর্যন্ত হযরত আবদুল্লাহ জেলে আটক রইলেন। মাহদীর মৃত্যুর পর লোকেরা তাঁকে মুক্ত করল। তিনি মক্কায় ফিরে এলেন।

হাব্বান ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে, খলীফা হারুনুর রশীদ একবার ভ্রমণে বের হলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল বনী হাশেমের সোলায়মান ইবনে আবু জাফর। খলীফা বললেন ঃ তোমার একটি বাঁদী চমৎকার গান গাইত। তাকে ডেকে আন। বাঁদী এল এবং গান গাইল। কিন্তু খলীফার পছন্দ হল না। খলীফা জিজ্ঞেস করলেন ঃ আজ তোমার কি হয়েছে? গান জমছে না কেন? বাঁদী বলল ঃ এ বাদ্যযন্ত্রটি আমার নয়। খলীফা খাদেমকে তার বাদ্যযন্ত্রটি নিয়ে আসতে আদেশ দিলেন। খাদেম বাদ্যযন্ত্র নিয়ে আসছিল, ইতিমধ্যে জনৈক বৃদ্ধ পথিমধ্যে খেজুরের আঁটি কুড়াচ্ছিল। খাদেম তাকে বলল ঃ বড় মিয়া, রাস্তা ছাড়। বৃদ্ধ মাথা তুলে তার হাতে বাদ্যযন্ত্র দেখতে পেল। সে তৎক্ষণাৎ তা খাদেমের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সজোরে মাটিতে নিক্ষেপ করল। ফলে বাদ্যযন্ত্রটি ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেল। খাদেম তাকে গ্রেফতার করে মহল্লার বিচারকের কাছে নিয়ে গেল এবং বলল ঃ একে হাজতে আটকে রাখ। সে আমীরুল মুমেনীনের অপরাধী। বিচারক বলল ঃ বাগদাদে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন এবাদতকারী নেই। সে আমীরুল মুমেনীনের অপরাধী হল কিরূপে? খাদেম বলল ঃ আমি যা বলছি, তা মেনে নাও। তর্ক করো না। এর পর খাদেম খলীফার কাছে যেয়ে ঘটনা বর্ণনা করল। খলীফা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। তার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করল। সোলায়মান বলল ঃ এত রাগ করার প্রয়োজন কি? মহল্লার বিচারককে আদেশ দিন, সে বৃদ্ধকে হত্যা করে লাশ দজলা নদীতে নিক্ষেপ করুক। খলীফা বললেন ঃ না, আমি তাকে ডেকে প্রথমে কথা বলব। সেমতে বৃদ্ধ উপস্থিত হলে খাদেম বলল ঃ তুমি তোমার বগলে বাঁধা খর্জূর আঁটির পুটলিটা ফেলে দাও; এর

পর খলীফার সামনে উপস্থিত হও। বৃদ্ধ বলল ঃ এটা আমার রাতের খাদ্য। খাদেম বলল ঃ রাতে আমরা খাইয়ে দেব। এজন্যে চিন্তা করো না। বৃদ্ধ বলল ঃ তোমাদের খাদ্য আমার দরকার নেই। তাদের কথাবার্তা শুনতে পেয়ে খলীফা বললেন ঃ এসব কথার প্রয়োজন নেই। বৃদ্ধকে আমার কাছে আসতে দাও। অতঃপর বৃদ্ধ সালাম করে খলীফার কাছে বসে গেল। খলীফা বললেন ঃ বড় মিয়া, তুমি যে কাণ্ডটি করলে এর কারণ কি? বৃদ্ধ জওয়াব দিল ঃ আমি কি করেছি? তুমি আমার বাদ্যযন্ত্র ভেঙ্গে দিয়েছ– এ কথা সরাসরি বলতে খলীফা সংকোচ বোধ করলেন। কয়েকবার একই প্রশ্ন করার পর বৃদ্ধ জওয়াব দিল ঃ আমি আপনার পিতৃপুরুষদেরকে মিম্বরে দাঁড়িয়ে এই আয়াত পাঠ করতে শুনতাম ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ -

নিশ্চয় আল্লাহ আদেশ করেন ন্যায়বিচার করার, অনুগ্রহ প্রদর্শন করার ও আত্মীয়দেরকে দান করার এবং নিষেধ করেন অশ্লীল, অপছন্দনীয় ও বিদ্রোহমূলক কাজ করতে।

আমি একটি অপছন্দনীয় বস্তু দেখেছি এবং তা ভেঙ্গে দিয়েছি। খলীফা বললেন ঃ ভালই করেছ– ভেঙ্গে দিয়েছ। এ ছাড়া খলীফা তাকে আর কিছু বললেন না। বৃদ্ধ বাইরে চলে এলে খলীফা খাদেমকে একটি থলে দিয়ে বললেন ঃ তার পেছনে যাও এবং দেখ, সে লোকজনদের কাছে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে কিছু বলে কি না? যদি কিছু না বলে, তবে এই থলেটি তাকে দিয়ে দিও। অন্যথায় দিয়ো না। বৃদ্ধ বাইরে এসে দেখল তার পুঁটলি থেকে একটি আঁটি মাটিতে পড়ে গেছে। সে সেটি পাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল এবং লোকজনের কাছে কিছুই বলল না। খাদেম তাকে বলল ঃ আমীরুল মুমেনীন তোমাকে এ থলেটি নিয়ে যেতে বলেছেন। বৃদ্ধ বলল ঃ খলীফাকে বলে দিয়ো এটি যেখান থেকে নিয়েছে, সেখানেই যেন ফেরত দিয়ে দেয়।

এসব গল্প থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার জন্যে কোন শাসনকর্তার অনুমতি লাভ করার মোটেই প্রয়োজন নেই।

পঞ্চম শর্ত হচ্ছে আদেশ ও নিষেধকারীর ক্ষমতাবান হওয়া। কেননা, অক্ষম ব্যক্তির উপর অন্তর দ্বারা আদেশ নিষেধ করা ছাড়া অন্য কিছু ওয়াজিব নয়। কারণ, যে আল্লাহর প্রতি মহব্বত রাখে, সে তাঁর

নাফরমানীকে খারাপ জ্ঞান করে এবং অন্তরে ঘৃণা করে। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ কাফেরদের সাথে জেহাদ কর হাত দ্বারা। যদি তা সম্ভব না হয় এবং কেবল তাদের সামনে নাক সিট্‌কাতে পার, তবে তাই কর। মনে রাখা দরকার, অক্ষমতা প্রমাণিত হওয়ার জন্যে কার্যত অনিষ্ট হওয়া এবং কষ্ট পাওয়া জরুরী নয়; বরং যেক্ষেত্রে অনিষ্ট হওয়া ও কষ্ট পাওয়ার আশংকা থাকে, সেখানে অক্ষমতা আছে বলতে হবে। এই অক্ষমতার কারণেও আদেশ নিষেধ করা ওয়াজিব থাকবে না। যদি জানা যায়, নিষেধ ফলপ্রসূ হবে না এবং নিষেধ করলে কষ্ট পাওয়ার আশংকা আছে, তবে নিষেধ করা ওয়াজিব নয়; বরং কতক ক্ষেত্রে আশ্চর্য নয় যে, হারাম হবে। এ ধরনের স্থানে না যাওয়া এবং গৃহে বসে থাকা অপরিহার্য। যদি জানা যায়, নিষেধ ফলপ্রসূ হবে না; কিন্তু কোন ক্ষতিরও আশংকা নেই, তবে নিষেধ করা মোস্তাহাব। যদি অবস্থা এর বিপরীত হয়; অর্থাৎ, জানা যায় যে, নিষেধ ফলপ্রসূ হবে; কিন্তু কষ্ট ভোগ করতে হবে, তবে এ অবস্থায়ও নিষেধ করা মোস্তাহাব। নিষেধ করা ওয়াজিব হওয়ার একটি মাত্র ক্ষেত্র হচ্ছে, যেখানে জানা যায়, নিষেধ ফলপ্রসূ হবে এবং কোন ক্ষতিরও আশংকা নেই। এ অবস্থাকেই বলা হয় "সর্বাবস্থায় সক্ষমতা।"

যে বিষয়ে আদেশ ও নিষেধ করা হয় তার শর্ত ঃ এর জন্যে চারটি শর্ত। প্রথম শর্ত, সেই বস্তুটির মুনকার তথা অস্বীকার্য হওয়া। অর্থাৎ শরীয়তে তা নিষিদ্ধ হওয়া। আমরা "অস্বীকার্য" শব্দটি ব্যবহার করেছি– গোনাহ বলিনি। কেননা, এটা গোনাহ থেকে ব্যাপকতর। উদাহরণতঃ যদি কেউ বালক অথবা উন্মাদকে শরাব পান করতে দেখে, তবে শরাব ফেলে দেয়া তার উপর ওয়াজিব। অথচ বালক ও উন্মাদের জন্যে শরাব পান করা গোনাহ নয়। কিন্তু অস্বীকার্য অবশ্যই। সুতরাং অস্বীকার্য শব্দের মধ্যে গোনাহসহ সকল প্রকার কুকর্ম দাখিল রয়েছে। এটি সগীরা ও কবীরা উভয় প্রকার গোনাহ হতেও ব্যাপক। কেননা, নিষেধ কেবল কবীরা গোনাহের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়। বরং গোসলখানায় উলঙ্গ হওয়া, বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা ইত্যাদি সগীরা গোনাহ থেকে নিষেধ করা ওয়াজিব।

দ্বিতীয় শর্ত, অস্বীকার্য বিষয়টি আপাত বিদ্যমান হওয়া। কেননা, যেব্যক্তি শরাব পান সমাপ্ত করে নেয় অথবা যে ভবিষ্যতে শরাব পান করবে বলে বিশ্বাস করা হয়, তাকে নিষেধ করা ওয়াজিব নয়।

তৃতীয় শর্ত, অস্বীকার্য বিষয়টি কোনরূপ খোঁজাখুঁজি ছাড়াই নিষেধকারীর সামনে প্রকাশ হওয়া। এমতাবস্থায় যদি কেউ গৃহে লুকিয়ে

গোনাহ্ করে এবং গৃহের দরজা বন্ধ করে নেয়, তবে গুপ্তচরবৃত্তি করে নিষেধ করা ওয়াজিব নয়। আল্লাহ তা'আলা এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। হযরত ওমর (রাঃ) একবার এক গৃহের প্রাচীরে আরোহণ করে গৃহকর্তাকে দেখতে পান এবং নিষেধ করেন। গৃহকর্তা আরজ করল ঃ আমীরুল-মুমেনীন, আমি আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী একভাবে করেছি। আর আপনি তিনভাবে করেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ সেটা কি? গৃহকর্তা বলল ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন– وَلَا تَجَسَّسُوا –তোমরা গুপ্তচরবৃত্তি করো না। আপনি গুপ্তচরবৃত্তি করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন– وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا তোমরা দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর। আপনি প্রাচীর টপকিয়ে গৃহে প্রবেশ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا -

তোমরা আপন গৃহ ছাড়া কারও গৃহে কথাবার্তা না বলে এবং গৃহের লোকদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করো না। আপনি সালাম করেননি।

হযরত ওমর অগত্যা নিরুত্তর হয়ে গৃহকর্তাকে ছেড়ে দিলেন। এমনিভাবে হযরত ওমর (রাঃ) একবার মিম্বরে দাঁড়িয়ে সাহাবায়ে কেরামকে প্রশ্ন করেন ঃ যদি আমি স্বচক্ষে কোন কুকর্ম সংঘটিত হতে দেখি, তবে কোন সাক্ষ্য ছাড়াই অপরাধীর উপর "হদ" (শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তি) জারি করতে পারব কি না? হযরত আলী (রাঃ) জওয়াব দিলেন ঃ হদের ব্যাপারটি কমপক্ষে দু'জন সাক্ষীর সাথে জড়িত। এতে একজন যথেষ্ট হবে না। প্রশ্ন হয়, অস্বীকার্য বিষয় প্রকাশ্যে হওয়া এবং গোপনে হওয়ার সংজ্ঞা কি? জওয়াব হচ্ছে, যেব্যক্তি গৃহের দরজা বন্ধ করে নেয় এবং প্রাচীরের আড়ালে চলে যায়, তার কাছে কেবল অস্বীকার্য বিষয় জানার জন্যে যাওয়ার অনুমতি নেই। হাঁ, যদি গৃহের বাইরে থেকে জানা যায়, এ গৃহে খারাপ কাজ হচ্ছে, তবে তাও প্রকাশ্য। উদাহরণতঃ বাইরে থেকে বাঁশী অথবা বাদ্যযন্ত্রের আওয়ায শুনা গেলে যে শুন্‌বে, সে গৃহে প্রবেশ করে বাদ্যযন্ত্র ভেঙ্গে দিতে পারে।

চতুর্থ শর্ত, ইজতিহাদ ছাড়াই জানা যে, এটা অস্বীকার্য বিষয়। সুতরাং যেসকল বিষয় ইজতিহাদী, সেগুলোতে নিষেধ করা যাবে না। উদাহরণতঃ কোন হানাফী মতাবলম্বীর জন্যে জায়েয নয় যে, সে কোন

শাফেয়ী মতালম্বীকে এমন যবেহ করা জন্তুর গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করবে, যাতে বিসমিল্লাহ্ বলা হয়নি। অনুরূপভাবে কোন শাফেয়ী মতাবলম্বীর জন্যে জায়েয নয় যে, সে হানাফী মতাবলম্বীকে "নবীয" (যাতে নেশা নেই) পান করতে নিষেধ করবে। কেননা, এগুলো ইজতিহাদী বিষয়।

যাকে নিষেধ করা হবে তার শর্ত ঃ এক্ষেত্রে সম্ভবতঃ এটা বলাই যথেষ্ট যে, তার মানুষ হওয়া শর্ত– মুকাল্লাফ (শরীয়তের বিধি-বিধানের যোগ্য) হওয়া শর্ত নয়। সেমতে পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, বালক মদ্যপান করলে তাকেও নিষেধ করতে হবে, যদিও সে প্রাপ্তবয়স্ক না হয়। এমনিভাবে উন্মাদ ব্যক্তি যিনা করলে তাকেও নিষেধ করতে হবে। তবে কিছু কাজ উন্মাদের জন্যে অস্বীকার্য নয়, যেমন নামায না পড়া, রোযা না রাখা ইত্যাদি।

স্বয়ং আদেশ ও নিষেধের স্বরূপ ঃ এর কয়েকটি স্তর ও আদব আছে। প্রথম স্তর, অস্বীকার্য বিষয়টি খোঁজাখুঁজি করা। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, এটা গুপ্তচরবৃত্তি বিধায় নিষিদ্ধ। অতএব অন্যের গৃহে কান পেতে বাদ্যের আওয়াজ শ্রবণ করা যাবে না। দ্বিতীয় স্তর, অস্বীকার্য বিষয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জ্ঞাত করা যে, এটা নিষিদ্ধ। কেননা, মাঝে মাঝে অজ্ঞতার কারণেও মানুষ এটা করে থাকে এবং জ্ঞাত হওয়ার পর তা বর্জন করে। উদাহরণতঃ গ্রামীণ মানুষ নামায পড়ে; কিন্তু রুকু-সেজদা উত্তমরূপে করে না। এ ক্ষেত্রে এটাই মনে করা হয় যে, সে জানে না, এভাবে নামায পড়লে নামায হয় না। যদি সে নামায না হওয়াতেই সম্মত থাকত, তবে নামাযই পড়ত না। অতএব তাকে নম্রতা সহকারে জ্ঞাত করে দেয়া ওয়াজিব। নম্রতা সহকারে এ জন্যে যে, জ্ঞাত করা প্রসঙ্গে অপরকে প্রকারান্তরে মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়। এতে অপরের মনে কষ্ট হয়। প্রয়োজনীয় বিষয়াদি বিশেষত শরীয়তের বিষয়াদি সম্পর্কে মূর্খ কথিত হতে সম্মত হয়– এরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম। অতএব জ্ঞাত করা যখন মূর্খতা দোষ প্রকাশ করার নামান্তর, তখন এর পরিণতি অপরের মনে কষ্ট দেয়া। তাই এ কষ্ট দূর করার উপায় হচ্ছে নম্র ভাষায় জ্ঞাত করা। উদাহরণতঃ উপরোক্ত গ্রাম্য ব্যক্তিকে বলা হবে– ভাই, মানুষ শিক্ষিত ও জ্ঞানী হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। আমিও নামাযের মাসআলা– মাসায়েল সম্পর্কে মূর্খ ছিলাম। কিন্তু আলেমগণ শিখিয়ে দিয়েছেন। মনে হয় তোমার গ্রামে কোন আলেম নেই। আলেমগণ আমাকে শিখিয়েছেন যে, নামাযে এভাবে স্থিরতা সহকারে রুকু-সেজদা করতে হবে। নইলে নামায ক্রটিপূর্ণ থেকে যাবে।

অতএব তুমিও এ বিষয়টি মনে রেখো এবং তদনুযায়ী নামায পড়ো। তৃতীয় স্তর, উপদেশ ও নসীহতের মাধ্যমে নিষেধ করা। এটা তাদের জন্যে যারা অস্বীকার্য বিষয়কে অস্বীকার্য জেনেও তা করে; যেমন কোন ব্যক্তি অব্যহতভাবে মদ্যপান করে, যুলুম করে অথবা মুসলমানের গীবত করে। তাকে উপদেশ দেয়া এবং আল্লাহর ভয় প্রদর্শন করা উচিত। তাকে এমন হাদীস শুনানো উচিত, যাতে এসব কাজের জন্য শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে এবং বুযুর্গানে দ্বীনের অভ্যাস ও পরহেযগারদের কাহিনী শুনানো উচিত। এক্ষেত্রে একটি মারাত্মক বিপদ থেকেও আত্মরক্ষা করা উচিত। তা হচ্ছে, আপন জ্ঞান-গরিমার আস্ফালন ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার নিয়তে উপদেশ দান করা আশ্চর্য নয়। এরূপ নিয়তে উপদেশ দিলে তা যে অনিষ্ট দূর করার জন্যে উপদেশ দেয়া হয়, তার চেয়ে বড় অনিষ্টের বিষয় হবে। এটা এমন হবে, যেমন কেউ নিজেকে জ্বালিয়ে অপরকে অগ্নি থেকে রক্ষা করে। এটা চরম মূর্খতা, ভয়াবহ আপদ এবং শয়তানের অভিনব জাল। এতেই মানুষের পদস্খলন ঘটে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যাকে দোষ-ক্রটি সম্পর্কে অবগত করে দেন এবং হেদায়াতের নূর দ্বারা যার অন্তশ্চক্ষু উন্মোচিত করে দেন, সে-ই এ বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারে। চতুর্থ স্তর গালমন্দ ও কঠোর ভাষা ব্যবহার করে নিষেধ করা। এর প্রয়োজন তখন, যখন নম্রতায় কার্যোদ্ধার হয় না। নম্রতায় কাজ হলে কঠোর ভাষার প্রয়োজন নেই। মোট কথা, উপদেশ নসীহত ফলদায়ক না হলেই কেবল কঠোর ও রুক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে নিষেধ করতে হবে। যেমন– হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেন ঃ

أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ -

ধিক তোমাদের জন্যে এবং তোমাদের উপাস্যদের জন্যে! তোমাদের কি ঘটে কিছু নেই?

কঠোর ভাষা বলে আমাদের উদ্দেশ্য অশ্লীল বকাবকি এবং মিথ্যা বলা নয়; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, এমন ভাষা বলা, যা অশ্লীল গণ্য হয় না; যেমন হে মূর্খ, হে নির্বোধ, হে পাপিষ্ঠ, তোর কি আল্লাহর ভয় নেই, ইত্যাদি বলা। কেননা, যে মন্দ কাজ করে, সে নির্বোধ। নির্বোধ না হলে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী কেন করত? সে-ই বুদ্ধিমান, যার বুদ্ধিমত্তার সাক্ষ্য রসূলে করীম (সাঃ) দেন। এরশাদ হয়েছে–

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْاَحْمَقُ مَنِ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ -

হুশিয়ার সে-ই, যার নফস অনুগত এবং যে মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্যে কাজ করে। আর নির্বোধ সে-ই, যে নফ্সের খেয়ালখুশীতে তার আনুগত্য করে এবং আল্লাহর কাছে মিথ্যা বাসনা করে।

যদি জানা যায়, কঠোর ভাষা বললেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মন্দ কাজ থেকে বিরত হবে না, তবে কিছু বলাই উচিত নয়; বরং বাহ্যিক অসন্তোষ প্রকাশ এবং তাকে হেয় জ্ঞান করেই ক্ষান্ত থাকবে। পঞ্চম স্তর, বল প্রয়োগের মাধ্যমে মন্দ কাজের সরঞ্জামাদি নষ্ট করে দেয়া। উদাহরণতঃ ক্রীড়া-কৌতুকের সাজ-সরঞ্জাম ভেঙ্গে ফেলা, মদ মাটিতে ঢেলে দেয়া, রেশমী পোশাক দেহ দেখে খুলে ফেলা, নাপাক অবস্থায় মসজিদে বসে থাকলে কান ধরে মসজিদ থেকে বের করে দেয়া ইত্যাদি, কিন্তু এই স্তরকে তখনই কার্যকর করা যাবে, যখন পূর্বোক্ত স্তরগুলো বিকল হয়ে যায়। এ স্তরটি কতক গোনাহে সম্ভবপর এবং কতক গোনাহে সম্ভবপর নয়। উদাহরণতঃ মুখ ও অন্তরের গোনাহ্ বল প্রয়োগে নষ্ট করা যায় না। ষষ্ঠ স্তর, ধমক দেয়া এবং ভীতি প্রদর্শন করা। উদাহরণতঃ এ কথা বলা যে, এ কাজ পরিত্যাগ কর, নতুবা তোমার মাথা ফাটিয়ে দেব। এতে আদব, যে কাজ করতে পারবে না, তা বলবে না; যেমন বলবে না যে, তোমার বাড়ী লুটে নেব। সপ্তম স্তর, হাতে, পায়ে প্রহার করা এবং অস্ত্র বের না করা। প্রয়োজনবোধে এটা সর্বসাধারণও করতে পারে; কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত করা যাবে না। অর্থাৎ, মন্দ কাজটি দফা হয়ে গেলে হাত-পা গুটিয়ে নিতে হবে।

আদেশ ও নিষেধকারীর আদব ঃ প্রকাশ থাকে যে, যেব্যক্তি অপরকে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে, তার মধ্যে তিনটি গুণ থাকা বাঞ্ছনীয়। জ্ঞান, পরহেযগারী ও সচ্চরিত্রতা। জ্ঞানের প্রয়োজন এ জন্যে, যাতে আদেশ ও নিষেধের সীমা জানা থাকে এবং কোন্ স্থলে আদেশ ও নিষেধ করতে হবে, তা বুঝতে পারে। পরহেযগারীর প্রয়োজন এ জন্যে, যাতে আদেশ ও নিষেধকারীর উপদেশ নসীহত জনপ্রিয় হয়। কেননা, ফাসেক ব্যক্তির মুখে সদুপদেশ শুনলে মানুষ হাসে। আর যার মধ্যে সচ্চরিত্রতা গুণ থাকে, সে কথাবার্তায় ও আচার-ব্যবহারে নম্র হয়। আদেশ ও নিষেধের জন্যে এটা মূলকথা। জ্ঞান ও পরহেযগারী এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। কেননা, যখন ক্রোধ উদ্বেলিত হয়, তখন তার মূলোৎপাটনের জন্যে জ্ঞান ও পরহেযগারী যথেষ্ট হয় না। পরহেযগারীও পূর্ণাঙ্গ তখনই হয়, যখন তার সাথে সচ্চরিত্রতা ও ক্রোধ দমনের ক্ষমতা এসে মিলিত হয়। উপরোক্ত তিনটি গুণের কারণেই

আদেশ ও নিষেধ সওয়াবের কাজ হয় এবং তা দ্বারা অস্বীকার্য বিষয়টিও দূরীভূত হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর একটি এরশাদও এসব আদবের প্রতি ইঙ্গিত করে। তিনি বলেন ঃ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ সে করবে, যে নম্রতা করে আদেশ করায়, নম্রতা করে নিষেধ করায়, সহনশীল হয় নিষেধ করায় এবং সমঝদার হয় নিষেধ করায়। এ থেকে বুঝা গেল, আদেশ ও নিষেধের কাজে সমঝদার হওয়া শর্ত।

এখানে আমাদের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, ফাসেক হওয়ার কারণে সৎ কাজের আদেশ নিষিদ্ধ হয়ে যায়, বরং উদ্দেশ্য, ফাসেকের কথার প্রভাব মানুষের অন্তরে প্রতিফলিত হয় না। নতুবা সৎকাজের আদেশ করার জন্যে সকল গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা জরুরী নয়। কেননা, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমরা রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলাম– আমরা কি সৎ কাজের আদেশ করব না, যে পর্যন্ত সেই সৎকাজ নিজেরা না করে নেই এবং আমরা কি অসৎ কাজ করতে নিষেধ করব না যে পর্যন্ত সকল মন্দ কাজ থেকে নিজেরা আত্মরক্ষা না করি? তিনি বললেন ঃ না; বরং তোমরা সৎ কাজের আদেশ কর, যদিও সকল সৎ কাজ নিজেরা না কর এবং অসৎ কাজ করতে নিষেধ কর, যদিও সকল অসৎ কাজ থেকে নিজেরা বেঁচে থাক না। জনৈক পূর্ববর্তী বুযুর্গ তাঁর পুত্রগণকে ওসিয়ত করেন, যখন তোমাদের কেউ সৎ কাজের আদেশ করার ইচ্ছা করে, তখন সে যেন আপন মনে সবর করতে দৃঢ়সংকল্প হয় এবং আল্লাহ তাআলার সওয়াবের উপর ভরসা করে। কেননা, যে সওয়াবের উপর ভরসা করে, সে নির্যাতনের কষ্ট অনুভব করে না। এ থেকে বুঝা গেল, আদেশ ও নিষেধের অন্যতম আদব হচ্ছে সবর করা। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা সৎকাজের আদেশের কাছেই সবর উল্লেখ করেছেন। সেমতে হযরত লোকমানের উক্তি এভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে–

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ ـ

হে বৎস, নামায কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ কর, অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং যে কষ্টের সম্মুখীন হও, তাতে সবর কর।

আর একটি আদব হচ্ছে পার্থিব সম্পর্ক হ্রাস করা, যাতে ভয় এবং মানুষের কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা না থাকে। জনৈক বুযুর্গের একটি বিড়াল ছিল। তিনি এর জন্যে প্রতিবেশী কসাইয়ের কাছ থেকে প্রত্যহ মাংসখণ্ড গ্রহণ করতেন। একদিন তিনি কসাইকে কোন অসৎ কাজে লিপ্ত

দেখে প্রথমে বিড়ালটিকে গৃহ থেকে বের করে দিলেন। এর পর কসাইকে সেই অসৎ কাজ করতে নিষেধ করলেন। কসাই বিরক্ত হয়ে বলল ঃ ভবিষ্যতে আপনার বিড়ালের জন্যে কিছুই দেব না। বুযুর্গ বললেন ঃ বিড়াল তাড়িয়ে দিয়েই আমি তোমাকে নিষেধ করতে এসেছি। এখন তোমার কাছে আমি কিছু আশা করি না। সত্য বলতে কি, বুযুর্গের এ উক্তি যথার্থ। কেননা, যেব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে পাওয়ার আশা ছিন্ন করবে না, সে আদেশ ও নিষেধ করতে সক্ষম হবে না। যে আশা করে তার দিক থেকে মানুষের মন ভাল থাকুক এবং মানুষ তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হোক, সে কিরূপে আদেশ ও নিষেধ করার সাহস করবে? হযরত কা'ব আহবার আবু মুসলিম খাওলানীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে তোমার মান-মর্যাদা কিরূপ? তিনি বললেন ঃ ভাল। কা'ব বললেন ঃ তওরাত তো বলে, মানুষ যখন সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করে, তখন স্বসম্প্রদায়ের মধ্যে তার মান-মর্যাদা ভাল থাকে না। আবু মুসলিম জওয়াব দিলেন ঃ তওরাতের কথা সত্য। জনৈক ওয়ায়েয খলীফা মামূনকে কঠোর ভাষায় সদুপদেশ দিলে খলীফা বললেন ঃ মিয়া সাব, নম্র ভাষায় কথা বল। দেখ, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-কে যিনি তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন– ফেরাউনের কাছে প্রেরণ করেছিলেন– যে আমার চেয়ে নিকৃষ্ট ছিল, কিন্তু তাঁকে নম্রতা করার আদেশ দিয়ে বলেছিলেন ঃ

فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى

'তাকে নরম কথা বল; সম্ভবত সে চিন্তা করবে অথবা ভয় করবে।'

আদেশ ও নিষেধকারীর উচিত এক্ষেত্রে পয়গম্বরগণের অনুসরণ করা। হযরত আবু উমামা বর্ণনা করেন– একবার জনৈক যুবক রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনি আমাকে যিনার অনুমতি দিন। এতে উপস্থিত লোকজন তার প্রতি ভীষণ চটে গেল এবং বের করে দিতে চাইল। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তাকে থাকতে দাও। এর পর যুবককে বললেন ঃ আমার কাছে এস। সে কাছে এসে সম্মুখে বসে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আচ্ছা বল তো, তোমার মা যিনা করুক– এটা তুমি পছন্দ করবে? সে বলল ঃ না। তিনি বললেন ঃ বীর পুরুষদের কাজই এটা যে, তারা মায়ের যিনা সহ্য করতে পারে না। আচ্ছা বল তো, তুমি তোমার কন্যার জন্যে যিনা পছন্দ করবে? সে বলল ঃ না। তিনি বললেন ঃ হাঁ, বীর পুরুষেরা তাদের কন্যার জন্যেও যিনা পছন্দ করে না। এর পর তিনি ফুফু ও খালাকে নিয়েও এমনি প্রশ্ন

করলেন এবং প্রত্যেক প্রশ্নের জওয়াবে যুবকটি কেবল 'না'-ই বলে গেল। এর পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আপন পবিত্র হাত যুবকটির বুকের উপর রাখলেন এবং বললেন ঃ ইলাহী, এর অন্তর পরিষ্কার করে দিন, তার গোনাহ্ মাফ করুন এবং তার লজ্জাস্থানের হেফাযত করুন। আবু উমামা বলেন ঃ এর পর এই যুবকটির কাছে যিনার চেয়ে জঘন্য পাপাচার অন্য কিছু ছিল না। হযরত ফোযায়ল ইবনে আয়াযকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না বাদশাহের দান গ্রহণ করেন। এটা কেমন? তিনি বললেন ঃ তিনি আপন পাওনার চেয়ে কমই নেন। এর পর তিনি সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়নাকে একান্তে নিয়ে যান এবং বলেন ঃ হে আলেম সম্প্রদায়, আপনারা শহরের প্রদীপ ছিলেন। আপনাদের কাছ থেকে মানুষ আলো লাভ করত। এখন আপনারা অন্ধকার তমসাচ্ছন্ন হয়ে গেছেন। আপনারা পথহারাদের জন্যে উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। আপনাদের দেখে দেখে মানুষ পথ চলত। এখন আপনারা দিকভ্রমের কারণ হয়ে গেছেন। এই শাসকবর্গের অর্থ গ্রহণ করতে আপনারা লজ্জা করেন না। এই অর্থ কোথা থেকে আসে, তা আপনাদের জানা আছে কি? এ কাজ করার পরও আপনারা বালিশে হেলান দিয়ে বলেন– অমুক অমুকের কাছ থেকে আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ কথা শুনে সুফিয়ান মাথা তুলে কয়েকবার আহ, আহ্ বললেন, এর পর আরজ করলেন ঃ আল্লাহর কসম, হে আবু আলী, আমি নেকবখত নই; কিন্তু নেকবখতগণের প্রতি মহব্বত অবশ্যই রাখি। হাম্মাদ ইবনে সালামা বলেন ঃ ছেলা ইবনে আশইয়াম (রহঃ)-এর কাছে এক ব্যক্তি আগমন করল। তার পাজামা গিঁঠের নীচে ছিল। মুরীদরা তার সাথে কঠোর ব্যবহার করতে চাইলে তিনি বললেন ঃ এ কাজটি আমাকে করতে দাও। আমি তোমাদেরকে এই উৎকণ্ঠা থেকে বাঁচিয়ে দেব। অতঃপর তিনি লোকটির কাছে গিয়ে বললেন ঃ ভাতিজা, তোমার সাথে একটি কথা আছে। লোকটি উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করল ঃ চাচাজান, সেটি কি? তিনি বললেন ঃ আমি চাই তুমি তোমার পাজামা নিজেই গিঁঠের উপরে তুলে নাও। সে "ভাল কথা" বলে অমনি পাজামা উপরে তুলে নিল। এর পর তিনি মুরীদগণকে বললেন ঃ যদি তোমরা তার সাথে রূঢ় আচরণ করতে, তবে সে অস্বীকার করে বসত এবং তোমাদেরকে মন্দ বলত। মুহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া বলেন ঃ আমি এক রাত্রে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদের কাছে গেলাম। তিনি মাগরিবের নামায পড়ে গৃহে আগমন করছিলেন। পথিমধ্যে দেখলেন, জনৈক মদমত্ত কোরায়শী তরুণ একজন মহিলাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মহিলার

ফরিয়াদ শুনে লোকজন একত্রিত হয়ে যুবককে মারতে উদ্যত হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ তাকে দেখে চিনে ফেলেন। তিনি লোকজনকে বললেন ঃ আমার ভাতিজাকে ছেড়ে দাও। এর পর তিনি তরুণকে কাছে ডাকলেন। সে লজ্জিত অবস্থায় কাছে এলে তিনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন ঃ আমার সাথে চল। তিনি তাকে গৃহে নিয়ে গেলেন এবং খাদেমকে বললেন ঃ একে তোমার কাছে রাখ। এর নেশা কেটে গেলে সে কি কাণ্ড করেছে তা তাকে বলবে এবং আমার সাথে দেখা না করে যেতে দেবে না। সেমতে নেশা কেটে যাওয়ার পর খাদেমের মুখে ঘটনা শুনে তরুণ খুব লজ্জিত হল এবং কান্নাকাটি করল। এর পর তাকে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদের সামনে উপস্থিত করা হলে তিনি বললেন ঃ তুমি আপন আভিজাত্য বিসর্জন দিয়ে যে কাণ্ড করলে তাতে তোমার লজ্জা করা উচিত ছিল। তুমি কি জান না তুমি কার সন্তান? আল্লাহকে ভয় কর এবং তওবা কর। তরুণ মাথানত করে কাঁদতে লাগল। অতঃপর মাথা তুলে বলল ঃ আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে অঙ্গীকার করলাম, জীবনে আর কোন দিন নবীয পান করব না এবং মন্দ কাজের ধারে-কাছে যাব না। আমি তওবা করলাম। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ তাকে কাছে টেনে মস্তকে চুম্বন করলেন এবং বললেন ঃ শাবাশ বেটা, এমনি চাই। এর পর থেকে সে তাঁর কাছেই থাকত এবং হাদীস লিপিবদ্ধ করত। বলাবাহুল্য, নম্রতার বদৌলতেই এটা সম্ভব হয়েছে। ফাতাহ্ ইবনে মানজরফ বলেন ঃ জনৈক সুঠাম সবল ব্যক্তি এক মহিলাকে ধরে ফেলে। তার হাতে ছিল ছোরা। কেউ তার কাছে গেলে সে ছোরা দিয়ে তাকে আক্রমণ করত। কেউ তার কাছে যাওয়ার সাহস করত না। মহিলাটি তার হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য আর্তনাদ করছিল। এমন সময় প্রখ্যাত সূফী বিশর ইবনে হারেস সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি আপন কাঁধ দিয়ে লোকটির কাঁধে ঘর্ষণ করলেন। অমনি সে ধরাশায়ী হল। হযরত বিশর সেখান থেকে চলে গেলেন। মহিলাটিও অক্ষত অবস্থায় সেখান থেকে প্রস্থান করল। লোকেরা দুর্বৃত্তটির কাছে গিয়ে তাকে ঘর্মাক্ত কলেবর দেখতে পেল। জিজ্ঞাসার জওয়াবে সে বলল ঃ আমি কিছুই জানি না। তবে একজন বৃদ্ধ লোক আমার কাছে এসে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোর কাজ-কর্ম এবং তোকে দেখছেন। এ কথা শুনামাত্রই আমার পা যুবগল অবশ হয়ে গেল। আমি জানি না, লোকটি কে ছিল। লোকেরা বলল ঃ তিনি বিশর ইবনে হারেস। সে বলল ঃ হায়, দুর্ভোগ, এখন তিনি আমাকে কি দৃষ্টিতে দেখবেন! সে সেদিনই জ্বরে আক্রান্ত হল এবং সপ্তম দিনে মারা গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ব্যাপক অস্বীকার্য বিষয়

অস্বীকার্য বিষয়সমূহ দু'প্রকার– মাকরূহ ও নিষিদ্ধ। মাকরূহ বিষয় থেকে নিষেধ করা মোস্তাহাব এবং চুপ থাকা মাকরূহ– হারাম নয়। আর নিষিদ্ধ বিষয়ে শক্তি থাকা সত্ত্বেও বাধা না দেয়া এবং চুপ থাকা হারাম। এ ধরনের অস্বীকার্য বিষয়সমূহ মসজিদে, বাজারে, পথিমধ্যে ও অন্যান্য স্থানে পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে আমরা এগুলো আলাদা আলাদাভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা করছি।

মসজিদ ও তেলাওয়াত সম্পর্কিত অস্বীকার্য বিষয় ঃ প্রথম, নামাযের রুকু ও সেজদা 'ইতমিনান' সহকারে তথা ধীরস্থিরভাবে না করে নামায নষ্ট করা। এই ইতমিনান না করলে নামায বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং এ বিষয়ে নিষেধ করা ওয়াজিব। (হানাফী মাযহাবে ইতমিনান বর্জন নামায শুদ্ধ হওয়ার পরিপন্থী নয়।)

দ্বিতীয়, কোরআন মজীদ ভুল তেলাওয়াত করা। এটা করতে নিষেধ করা এবং শুদ্ধরূপে তেলাওয়াত শিখিয়ে দেয়া ওয়াজিব। যেব্যক্তি কোরআন পাঠে বেশী ভুল করে, সে যদি শুদ্ধ করতে সক্ষম হয়, তবে শুদ্ধ করা পর্যন্ত তেলাওয়াত থেকে বিরত থাকবে। কেননা, ভুল তেলাওয়াত করলে গোনাহ্গার হবে। যদি জিহ্বার জড়তার কারণে শুদ্ধ পাঠের ক্ষমতা না থাকে, তবে তেলাওয়াত বর্জন করে কেবল আলহামদু সূরা শিখতে ও তা শুদ্ধ করতে সচেষ্ট হবে।

তৃতীয়, আযানে মুয়াযযিনদের স্বর অধিক দীর্ঘ করা, হাইয়া আলাস্সালাহ্ ও হাইয়া আলাল ফালাহ্ বলার সময় বক্ষ কেবলার দিক থেকে ঘুরিয়ে নেয়া– এগুলো মাকরূহ অস্বীকার্য বিষয়। মুয়াযযিনদেরকে এ সম্পর্কে জ্ঞাত করা ওয়াজিব। যদি তারা জ্ঞাতসারে এরূপ করে, তবে নিষেধ করা মোস্তাহাব।

চতুর্থ, খতীবের এমন কালো পোশাক পরিধান করা, যাতে রেশমী সূতা অধিক, অথবা তার হাতে সোনালী তরবারি থাকা– এগুলো ফেস্ক বিধায় নিষেধ করা ওয়াজিব।

পঞ্চম, যে ওয়ায়েয তার ওয়াযে বেদআত মিশ্রিত করে অথবা মিথ্যা কাহিনী বর্ণনা করে, সে ফাসেক। তাকে নিষেধ করা ওয়াজিব। বেদআতী

ওয়ায়েযের ওয়াযে যোগদান করা উচিত নয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে আদেশ করেন—

فَاعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوضُوا فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِ -

আপনি তাদের কাছ থেকে সরে যান যে পর্যন্ত তারা অন্য কথায় নিবিষ্ট না হয়।

ষষ্ঠ, জুমুআর দিনে ওষুধ, খাদ্য, তাবিয ইত্যাদি বিক্রয় করার জন্য মসজিদে সমবেত হওয়া, ভিক্ষুকদের দণ্ডায়মান হওয়া এবং কবিতা ও কোরআন পাঠ করা, যাতে মুসল্লীরা শুনে কিছু দান করে, ইত্যাদি অস্বীকার্য বিষয়। মসজিদের বাইরে হলে অবশ্য মোবাহ্; যেমন ওষুধ, খাদ্য ও কিতাব বিক্রয় করা। এগুলো মসজিদের ভিতরেও জায়েয; কিন্তু না করা উত্তম, কিন্তু সদা-সর্বদার জন্য মসজিদকে দোকান বানিয়ে নেয়া হারাম এবং এটা নিষেধ করতে হবে।

সপ্তম, উন্মাদ, বালক ও মাতালদের মসজিদে আসা অস্বীকার্য বিষয়। বালকরা মসজিদে অধিক খেলাধুলা না করলে তাদের প্রবেশে দোষ নেই। তারা মসজিদে সদা-সর্বদা খেলা করলে নিষেধ করা ওয়াজিব। যে উন্মাদ মসজিদে চুপচাপ থাকে, অশ্লীল বকাবকি করে না এবং উলঙ্গ হয় না, তাকে মসজিদ থেকে বের করে দেয়া ওয়াজিব নয়।

রাস্তা ও বাজার সম্পর্কিত অস্বীকার্য বিষয় ঃ বাজারসমূহে যেসকল অসৎ কাজ সংঘটিত হয়, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, পণ্যদ্রব্য মুনাফায় বিক্রি করার ব্যাপারে মিথ্যা বলা হয়। অতএব যেব্যক্তি বলে, আমি এটি এত টাকায় কিনেছি এবং এত টাকায় বিক্রি করব, সে যদি এতে মিথ্যা বলে, তবে সে ফাসেক। আর যেব্যক্তি এ অবস্থা জানে, ক্রেতাকে এই মিথ্যা সম্পর্কে জ্ঞাত করা তার উপর ওয়াজিব। যদি সে বিক্রেতার খাতিরে চুপ থাকে, তবে গোনাহগার হবে এবং খেয়ানতে বিক্রেতার অংশীদার হবে। দ্বিতীয়, পণ্যদ্রব্যের দোষ ক্রেতার কাছে গোপন রাখা। যেব্যক্তি দোষ সম্পর্কে জ্ঞাত, ক্রেতাকে বলে দেয়া তার অবশ্য কর্তব্য। নতুবা এর অর্থ হবে, সে মুসলমান ভাইয়ের আর্থিক ক্ষতিতে রাজি আছে। এটা হারাম। তৃতীয়, ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে অবৈধ শর্ত করা, যার অভ্যাস মানুষের আছে। এটা নিষেধ করা ওয়াজিব। কেননা, এতে লেনদেন ফাসেদ হয়ে যায়। চতুর্থ, ঈদের দিনে শিশুদের জন্যে খেলনা এবং প্রাণীর ছবি বিক্রয় করা উচিত নয়। এগুলো ভেঙ্গে দেয়া এবং বিক্রয় করতে নিষেধ করা ওয়াজিব। সোনা-রূপার পাত্র এবং রেশমী বস্ত্র বিক্রয় করাও তেমনি

নিষিদ্ধ। রাস্তার অস্বীকার্য বিষয়সমূহের মধ্যে রয়েছে গৃহ সংলগ্ন স্থানে খুঁটি গেড়ে চত্বর নির্মাণ করা, বৃক্ষ রোপণ করা, রাস্তায় বারান্দা, গ্যালারী ও ছাদ নির্মাণ করা, কাষ্ঠ পুঁতে রাখা এবং বোঝা ইত্যাদি রাস্তায় ফেলে রাখা। এতে যদি রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে যায়, অথবা পথিকদের পায়ে টক্কর লাগে, তবে এগুলো সব গর্হিত কাজ। যদি রাস্তা এত প্রশস্ত হয় যে, এতে কারও কোন ক্ষতি হয় না, তবে নিষেধ করা উচিত নয়। এমনিভাবে গবাদিপশু রাস্তায় এমনভাবে বাঁধা যাবে না, যাতে রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং পথিকদের গায়ে প্রস্রাব-পায়খানার ছিটা পড়ে। কসাই যদি তার দোকানের সামনে গবাদিপশু যবেহ করে এবং এতে রাস্তা রক্তাক্ত হয়ে যায়, তবে তাকে নিষেধ করা হবে। রাস্তায় আবর্জনা নিক্ষেপ করা, খরবুযা, তরমুজ ও কলার ছাল ফেলে রাখা অথবা পানি ঢেলে চলার পথ পিচ্ছিল করে দেয়া অপছন্দনীয় কাজ। এগুলো করতে নিষেধ করতে হবে। যে কুকুর মানুষকে কামড় দেয়, সেটি দরজায় বসিয়ে রাখতে নিষেধ করা ওয়াজেব।

দাওয়াত সম্পর্কিত অস্বীকার্য বিষয় ঃ এগুলোর মধ্যে রয়েছে পুরুষ মেহমানদের জন্যে রেশমী ফরশ বিছানো, স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার করা, জীব-জন্তুর চিত্র সম্বলিত পর্দা ঝুলানো, গান-বাজনার ব্যবস্থা করা, পুরুষ অতিথিদের দেখার জন্যে মহিলাদের ছাদের উপর সমবেত হওয়া— এসব বিষয় নিষিদ্ধ ও অস্বীকার্য। এগুলো দূর করা ওয়াজিব। যে ব্যক্তি দূর করতে অক্ষম, তার সেখানে বসা নাজায়েয। রৌপ্য নির্মিত ক্ষুদ্র সুরমাদানীর ব্যাপারে মতভেদ আছে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রৌপ্য নির্মিত সুরমাদানী দেখে ভোজসভা থেকে বাইরে চলে যান। দাওয়াতের মজলিসে কোন ব্যক্তি রেশমী বস্ত্র কিংবা স্বর্ণের আংটি পরিহিত থাকলে তার কাছে বসা জায়েয নয়। দাওয়াতে খাদ্যে অপব্যয় করাও একটি গর্হিত কাজ। অবৈধ কাজে অর্থ ব্যয় করাই শুধু অপব্যয় নয়; বৈধ কাজে মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় করাকেও অপব্যয় বলা হয়। এই মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়ের বিধান মানুষের অবস্থাদৃষ্টে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কোন কোন অবস্থায় নিষেধ করা ওয়াজিব হবে। উদাহরণতঃ জনৈক ছা-পোষা ব্যক্তির কাছে এক হাজার টাকা আছে। এ টাকা ছাড়া তার অন্য কোন আমদানী নেই। সে যদি এই টাকা সম্পূর্ণ ওলিমা অনুষ্ঠানে ব্যয় করে দেয়, তবে তাকে এই অপব্যয় থেকে নিষেধ করা ওয়াজিব হবে।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا 'তুমি আপন হস্ত সম্পূর্ণরূপে প্রসারিত করো না, অর্থাৎ,

যথাসর্বস্ব ব্যয় করে দিয়ো না; যদি কর, তবে তিরস্কৃত ও অনুতপ্ত হয়ে বসে থাকবে।'

এ আয়াতটি মদীনার এক ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। সে তার সমস্ত ধন-সম্পদ বন্টন করে দিয়েছিল। পরে যখন তার পরিজনরা তার কাছে খরচ চাইল, তখন সে কিছুই দিতে পারল না।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشيطين -

অযথা ব্যয় করো না। নিশ্চয় যারা অযথা ব্যয় করে, তারা শয়তানের ভাই।

অতএব যেব্যক্তি এরূপ অপব্যয় করে, তাকে নিষেধ করা উচিত। হাঁ, যেব্যক্তি একা পরিবার-পরিজন বলতে কেউ নেই এবং সে তাওয়াক্কুল করারও বদ্ধমূল ক্ষমতা রাখে, তার জন্যে সমস্ত ধন-সম্পদ সৎকাজে ব্যয় করে দেয়া জায়েয, কিন্তু ছাপোষা ও তাওয়াক্কুলে অক্ষম ব্যক্তির জন্যে এটা জায়েয নয়। অনুরূপভাবে প্রাচীর গাত্রে নকশা অংকনে সমস্ত ধন-সম্পদ ব্যয় করাও হারাম অপব্যয়, কিন্তু যার কাছে অগাধ ধন-সম্পদ আছে, তার জন্যে হারাম নয়। কেননা, সাজসজ্জাও একটি বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য। চিরকালই মসজিদের ছাদে এবং প্রাচীরে কারুকার্য হয়ে এসেছে। অথচ সৌন্দর্যবর্ধন ছাড়া এসব কারুকার্যের অন্য কোন উপকারিতা নেই। পোশাক ও খাদ্যের শোভাবর্ধনের বিধানও তাই; অর্থাৎ, এটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে মোবাহ্, কিন্তু যার ধন-সম্পদ কম, তার জন্যে অপব্যয় এবং বিত্তশালীদের জন্যে জায়েয।

যেসকল অস্বীকার্য বিষয়ে সাধারণ মানুষ লিপ্ত ঃ আজকাল যারা গৃহে বসে থাকে, তারাও মানুষকে ধর্মের কথা বলা, শিক্ষা দেয়া ও সৎকাজের উৎসাহ দেয়া থেকে গা বাঁচিয়ে চলে। এখন শহরেও অধিকাংশ লোক নামাযের শর্তসমূহ সম্পর্কে অজ্ঞ। গ্রামে তো হবেই। শহরের প্রতিটি মহল্লায় ও মসজিদে একজন আলেম থাকা আবশ্যক, যিনি মানুষকে ধর্মের কথাবার্তা শিক্ষা দেবেন। এমনিভাবে প্রত্যেক গ্রামে এ কাজের জন্যে একজন আলেম থাকা দরকার। যে আলেম তার 'ফরযে আইন' সমাপ্ত করেছে এবং 'ফরযে কেফায়া' পালন করার অবসর আছে, তার উচিত তার শহরের আশেপাশে যারা বাস করে, তাদের কাছে যাওয়া এবং তাদেরকে শরীয়তের বিষয়াদি শিক্ষা দেয়া। সে নিজের পাথেয় সঙ্গে নিয়ে যাবে এবং তা থেকেই খাবে- অজ্ঞদের খাদ্য খাবে না। কেননা, তাদের অধিকাংশ খাদ্য সন্দেহযুক্ত। যদি একজন আলেমও এ কাজে ব্রতী

হয়, তবে অবশিষ্ট সকল আলেম এ দায়িত্ব থেকে খালাস পেয়ে যাবে। নতুবা সকলেই অপরাধী হবে। আলেমরা এ জন্যে অপরাধী হবে যে, তারা শহরের বাইরে গিয়ে শিক্ষা দেয়নি এবং অজ্ঞরা এজন্যে অপরাধী হবে যে, তারা শিক্ষা গ্রহণে ত্রুটি করেছে। যে সাধারণ ব্যক্তি নামাযের শর্তসমূহ জানে, অপরকে শিক্ষা দেয়া তার উপর ওয়াজিব। নতুবা গোনাহে সে-ও শরীক থাকবে। এটা জানা কথা যে, কোন ব্যক্তি মায়ের পেট থেকে শরীয়তের আলেম হয়ে জন্মগ্রহণ করে না; বরং আলেমদের উপর শরীয়তের বিধি-বিধান পৌঁছে দেয়া ওয়াজিব হয়ে থাকে। অতএব যেব্যক্তি একটি মাসআলাও জানবে- তাকেও সে বিষয়ের আলেম বলা হবে। এতেও সন্দেহ নেই যে, আলেমদের গোনাহ্ বেশী হবে। কারণ, তাদের শিক্ষা দেয়া ও বলে দেয়ার পর্যাপ্ত ক্ষমতা আছে। তাদের শান ও পেশাই হচ্ছে, যা কিছু রসূলে আকরাম (সাঃ) থেকে তাদের কাছে পৌঁছে তা অন্যের কাছে পৌছে দেয়া। আলেমরাই পয়গম্বরগণের ওয়ারিস এবং এই অর্থেই ওয়ারিস। লোকেরা ভালরূপে নামায পড়ে না- এ ওযর দেখিয়ে কারও গৃহে বসে থাকা এবং মসজিদে না আসা জায়েয নয়। বরং এ অবস্থা জানা গেলে শিক্ষা দেয়া ও নিষেধ করার জন্যে বাইরে আসা তার উপর ওয়াজিব। অনুরূপভাবে যে জানে, বাজারে একটি অস্বীকার্য কাজ সর্বদা একটি নির্দিষ্ট সময়ে সংঘটিত হয়, সে যদি তা দূর করতে সক্ষম হয়, তবে গৃহে বসে থাকা এবং তা দূর না করা তার জন্যে জায়েয নয়। যদি সে অস্বীকার্য কাজটি দেখা থেকে গা বাঁচাতে চায়, তবু বের হওয়া তার জন্যে জরুরী। কেননা, যখন এ কারণে বের হবে যে, যতটুকু কুকর্ম দূর করতে সক্ষম হবে, ততটুকু দূর করবে, তখন সেই অস্বীকার্য কাজটি দেখায় তার কোন ক্ষতি হবে না। বলাবাহুল্য, কোন বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য ছাড়া দেখলে সেই দেখাই ক্ষতিকর হয়ে থাকে।

মোট কথা, প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, ফরযসমূহ অব্যাহতভাবে পালন এবং হারাম বিষয়াদি পরিত্যাগ করে প্রথমে আত্মসংশোধন করা। নিজের সংশোধনের পর গৃহের লোকজনকে এসব বিষয় শিক্ষা দেবে, এর পর পড়শীদেরকে, এর পর মহল্লাবাসীকে, এর পর শহরবাসীকে, এর পর শহরের আশেপাশের লোকদেরকে, অবশেষে গ্রামবাসীদেরকে শিক্ষা দেবে। যে এলাকায় এক ব্যক্তিও কোন ধর্মীয় ফরয সম্পর্কে জাহেল থাকবে এবং কোন আলেমের নিজে গিয়ে অথবা অন্যের মাধ্যমে তাকে শিক্ষা দেয়ার ক্ষমতা থাকে, সেই পর্যন্ত এ দায়িত্ব থেকে কেউ রেহাই পাবে না। যারা ধর্মের চিন্তা রাখে, তাদের জন্যে এ কাজটি নেহায়েত জরুরী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শাসক শ্রেণীকে আদেশ ও নিষেধ করা

ইতিপূর্বে আমরা আদেশ ও নিষেধের কয়েকটি স্তর বর্ণনা করেছি। এগুলোর মধ্যে শাসকবর্গের সাথে প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর জায়েয; অর্থাৎ, জ্ঞাত করা ও উপদেশ দেয়া। চতুর্থ স্তর অর্থাৎ, জোরে জবরে শাসিতদের জন্যে শাসকদের নিষেধ করা জায়েয নয়। কারণ, এতে অনর্থ ও গোলযোগ সংঘটিত হবে। ফলে নেকী বরবাদ এবং গোনাহ অবশ্যম্ভাবী হবে। তৃতীয় স্তর অর্থাৎ, কঠোর ভাষায় নিষেধ করা; যেমন শাসককে "হে যালেম", "হে খোদাদ্রোহী" ইত্যাদি বলা– এতে যদি ব্যাপক অনিষ্টের আশংকা থাকে এবং বক্তা ছাড়া অন্যদেরও ক্ষতি হয়, তবে এরূপ বলা জায়েয নয়। আর যদি কেবল বক্তারই ক্ষতি এমনকি, প্রাণনাশের আশংকা হয়, তবে জায়েয; বরং মোস্তাহাব। কেননা, পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের রীতি ছিল, তাঁরা শাসকবর্গকে আদেশ ও নিষেধ করার ব্যাপারে প্রাণনাশের আশংকাকে তুচ্ছ মনে করতেন এবং নানাবিধ বিপদাপদ ও শাস্তি অম্লান বদনে বরণ করে নিতেন। কারণ, তাঁরা জানতেন, আদেশ ও নিষেধ করার পরিণতিতে যদি মারা যান, তবে শহীদ হবেন। যেমন নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন,

خَيْرُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ رَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ
فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فِي ذَاتِ اللّٰهِ تَعَالَى فَقَتَلَهُ ـ

সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ হলেন হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব, এর পর সে ব্যক্তি, যে কোন শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে আল্লাহর ওয়াস্তে আদেশ ও নিষেধ করে। অতঃপর শাসক তাকে হত্যা করে।

এক হাদীসে বলা হয়েছে–

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ ـ

শ্রেষ্ঠ জেহাদ হচ্ছে অত্যাচাবী শাসকের সামনে সত্যের বাণী উচ্চারণ করা।

শাসকবর্গকে উপদেশ দেয়া এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার সত্যিকার রীতিনীতি তাই, যা পূর্ববর্তী মনীষীগণ থেকে বর্ণিত আছে। আমরা এ সম্পর্কিত কিছু গল্প ও কাহিনী হালাল হারাম

অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করে এসেছি। এখানে কেবল সেসব গল্প উদ্ধৃত করতে চাই, যেগুলো দ্বারা উপদেশের আকার আকৃতি এবং শাসকবর্গের গর্হিত কর্মকাণ্ড অস্বীকার করার অবস্থা জানা যায়। এসব গল্পের মধ্য থেকে একটি হচ্ছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর কোরায়শ সর্দারদেরকে নিষেধ করার গল্প। গল্পটির বর্ণনাকারী হচ্ছেন ওরওয়া (রাঃ)। তিনি বলেন ঃ আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে প্রশ্ন করলাম, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ঘোর শত্রু কোরায়শ সর্দারেরা তাঁর উপর যে যে নির্যাতন চালিয়েছে, তন্মধ্যে সর্বাধিক নিষ্ঠুর নির্যাতন আপনি কোন্‌টি দেখেছেন? তিনি জওয়াবে বললেন ঃ একদিন আমি কোরায়শদের কাছে গেলাম। তারা হাতীমে কা'বায় সমবেত ছিল। তারা রসূলে করীম (সাঃ)-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলল, আমরা তার ব্যাপারে অনেক সহ্য করেছি, যা অন্য কারও ব্যাপারে কখনও করিনি। সে আমাদের জ্ঞানীদেরকে বেওকুফ বলেছে, পূর্বপুরুষদেরকে গালি দিয়েছে, আমাদের ঐক্য সংহতি বিনষ্ট করেছে এবং আমাদের উপাস্যদের উদ্দেশে কটূক্তি করেছে, কিন্তু আমরা এসব গুরুতর বিষয়ে সবর করেছি। তারা এসব কথাবার্তা বলছিল, এমন সময় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি 'হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করার পর তওয়াফ করতে করতে তাদের কাছ দিয়ে গেলেন। কাছে আসার সাথে সাথে সমবেত কোরায়শরা তাঁর প্রতি বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি নিক্ষেপ করল। আমি তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলে এর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলাম। এর পর তওয়াফের দ্বিতীয় চক্করে তিনি যখন আবার তাদের কাছে এলেন, তখন তারা আবার বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি দিল। এমনিভাবে তৃতীয়বার যখন তারা এমনি আচরণ প্রদর্শন করল, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ হে কোরায়শ দল, সেই আল্লাহর কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আমি তোমাদের জন্যে মৃত্যু আনয়ন করছি। (অর্থাৎ ইসলাম তোমাদের কাছে মৃত্যুর মত অসহনীয়।) একথা শুনে সকলেই মাথা নীচু করে নিল। তারা এমন চুপ হয়ে গেল যেন প্রত্যেকের মাথায় কোন পাখী বসে আছে। এ বাক্যটির প্রভাবে ইতিপূর্বে যেব্যক্তি তাঁকে যন্ত্রণাদানে অধিক উৎসাহী ছিল, সে-ও যে নম্র থেকে নম্র ভাষা পেল, তা দিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। তারা বলল ঃ হে আবুল কাসেম, আপনি নির্বিঘ্নে চলে যান। আপনি মূর্খ নন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অগত্যা চলে গেলেন। দ্বিতীয় দিন কোরায়শরা পুনরায় হাতীমে সমবেত হল। আমিও তাদের সঙ্গে ছিলাম। তারা পরস্পরে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নিয়েই কথাবার্তা বলছিল। এমন সময় তিনি দৃষ্টিগোচর হলেন। তারা

একযোগে লাফিয়ে উঠল এবং চতুর্দিক থেকে তাঁকে ঘিরে নিল। তারা প্রশ্ন করতে লাগল ঃ আপনিই এমন বলেন, আপনিই এমন বলেন? তারা সেসব কথা উল্লেখ করছিল, যা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের প্রতিমা ও ধর্ম সম্পর্কে বলতেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জওয়াবে বললেন ঃ হাঁ, আমিই এসব কথা বলি। এর পর আমি দেখলাম, জনৈক কোরায়শী তাঁর চাদর ধরে হেঁচকা টান দিল এবং তাঁকে হেঁচড়াতে লাগল। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) পশ্চাতে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন ঃ দুর্ভোগ তোমাদের, তোমরা কি তাঁকে এজন্যে মেরে ফেলবে যে, তিনি বলেন আমার পালনকর্তা আল্লাহ্? এর পর কোরায়শরা তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। আমি দেখলাম, কোরায়শরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এর আগে কখনও এত যন্ত্রণা দেয়নি। অন্য এক রেওয়ায়েতে আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কা'বা গৃহের আঙ্গিনায় ছিলেন, এমন সময় ওকবা ইবনে আবু মুয়ীত সেখানে এসে তাঁর পবিত্র কাঁধে হাত রাখল। অতঃপর নিজের চাদর তাঁর গলায় রেখে তাঁকে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলতে চাইল। এমন সময় হযরত আবু (রাঃ) বকর দৌড়ে এসে ওকবাকে ঘাড় ধরে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ

اتقتلون رجلا ان يقول ربى الله وقد جاءكم بالبينت من ربكم -

'তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এই অপরাধে হত্যা করতে চাও, যে সে আল্লাহকে নিজের পালনকর্তা বলে? অথচ সে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে।'

বর্ণিত আছে, হযরত আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ) মুসলমানদের ভাতা বন্ধ করে দেন। একদিন তিনি খোতবা পাঠ করছিলেন, এমন সময় আবু মুসলিম খাওলানী (রঃ) তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ হে মোয়াবিয়া, যেসব অর্থসম্পদ তুমি আটকে রেখেছ, সেগুলো না তোমার পরিশ্রমলব্ধ, না তোমার বাপের পরিশ্রমলব্ধ, না তোমার মায়ের পরিশ্রমলব্ধ। হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) এতে ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি মিম্বর থেকে নেমে সকলের দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেলেন এবং বলে গেলেন ঃ তোমরা যে যেখানে আছ, সেখানেই বসে থাক। এক ঘন্টা পর তিনি গোসল করে বের হয়ে বললেন ঃ আবু মুসলিম আমাকে এমন কথা বলল, যাতে আমার ভীষণ রাগ ধরে গেল। আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি– ক্রোধ শয়তানের পক্ষ থেকে। শয়তান অগ্নি দ্বারা সৃজিত। অগ্নি পানি দ্বারাই নির্বাপিত হয়। অতএব তোমাদের মধ্যে কারও ক্রোধ হলে সে যেন গোসল করে নেয়। আমিও তাই অন্দরে গিয়ে গোসল করে

এসেছি। এখন বলছি– আবু মুসলিম ঠিকই বলেছে। এই ধন-সম্পদ আমার পিতা এবং মাতা কারও উপার্জিত নয়। অতএব মুসলমানগণ এস, আপন আপন ভাতা নিয়ে যাও।

যাব্বা ইবনে মুহসিন আন্তরী বলেন ঃ বসরায় আমাদের গভর্নর ছিলেন হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)। তাঁর রীতি ছিল, যখন খোতবা দিতেন, তখন আল্লাহ্ তাআলার হামদ পাঠ করতেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি দুরূদ পাঠ করতেন এবং খলীফা হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর জন্যে দোয়া করতেন। তিনি প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর প্রতি লক্ষ্যই করতেন না। আমার কাছে এটা খারাপ মনে হল। একদিন আমি দাঁড়িয়ে গেলাম এবং বললাম ঃ আপনি প্রথম খলীফার প্রতি লক্ষ্য করেন না। আপনি কি হযরত ওমর (রাঃ)-কে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করেন? তিনি কয়েক জুমায় তাই করলেন। এর পর তিনি হযরত ওমরের খেদমতে অভিযোগ লেখে পাঠালেন, যাব্বা ইবনে মুহসিন আমার খোতবার মাঝখানে বাধা সৃষ্টি করে। খলীফা জওয়াবে লেখলেন, যাব্বাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। সেমতে হযরত আবু মূসা (রাঃ) আমাকে খলীফার কাছে প্রেরণ করলেন। মদীনায় পৌঁছে আমি খলীফার দরজার কড়া নাড়লাম। তিনি বাইরে এসে আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম ঃ আমি যাব্বা ইবনে মুহসিন, যাকে আপনি ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ 'মারহাবা'-ও নয় এবং 'আহলান'-ও নয়। আমি আরজ করলাম ঃ মারহাবা তো আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে, আর 'আহলান'-এর আস্থা, আমি পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ কিছুই রাখি না। এখন বলুন, আপনি যে আমাকে আমার শহর থেকে বিনা অপরাধে ডেকে আনলেন, এটা কি কারণে জায়েয বিবেচিত হল? তিনি বললেন ঃ তোমার মধ্যে এবং আমার গভর্নরের মধ্যে ঝগড়াটা কিসের জানতে চাই। আমি বললাম ঃ তাহলে শুনুন, তাঁর রীতি হচ্ছে, তিনি খোতবা পাঠ করার সময় আল্লাহ্ তাআলার হামদ ও সানা পাঠ করে দরূদ পড়তেন, এর পর আপনার জন্যে দোয়া করতেন। তাঁর এ কাণ্ড দেখে আমি ক্ষুব্ধ হই। একদিন সামনে দাঁড়িয়ে বললাম ঃ আপনি হযরত আবু বকর সিদ্দীকের প্রতি ধ্যান দেন না কেন? তিনি কয়েক জুমায় তাই করলেন, এর পর আমার বিরুদ্ধে আপনার কাছে অভিযোগ করলেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) একথা শুনে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম, তুমি আমার গভর্নরের তুলনায় অধিক তওফীকপ্রাপ্ত এবং সুপথপ্রাপ্ত। তুমি আমার ত্রুটি মার্জনা কর। আল্লাহ্ তাআলা তোমার ত্রুটি

মার্জনা করবেন। আমি বললাম ঃ আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে মাফ করুন হে আমীরুল মুমেনীন। অতঃপর তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আবু বকর সিদ্দীকের একটি দিন ও রাত ওমর এবং তার বংশধরের চেয়ে উত্তম। আমি কি তোমাকে সেই রাত ও দিনের কথা বলব না। আমি আরজ করলাম ঃ উত্তম, বলুন। তিনি বললেন ঃ আবু বকর সিদ্দীকের সে রাত হচ্ছে, যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মুশরিকদের নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার ইচ্ছায় রাতের বেলায় মক্কা থেকে বের হলেন, তখন আবুবকর তাঁর সাথে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তিনি কখনও তাঁর অগ্রে, কখনও পেছনে, কখনও ডানে এবং কখনও বামে চলতেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ হে আবু বকর, ব্যাপার কি? আমি তো তোমাকে অন্য কোন সময় এরূপ করতে দেখিনি। তিনি আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, যখন আমি মনে করি, কেউ ওৎ পেতে বসে আছে কি না, তখন আপনার অগ্রে চলে যাই, আর যখন দৌড়ে আসার কথা চিন্তা করি, তখন পেছনে চলে যাই। ডানে বামেও আপনার হেফাযতের খাতিরে চলি। কারণ, আপনার ব্যাপারে আমি শংকিত।

মোট কথা, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সারারাত পায়ের অঙ্গুলিতে ভর দিয়ে অতি সন্তর্পণে পথ চললেন। ফলে পায়ের অঙ্গুলি ফুলে টন্ টন্ করতে লাগল। হযরত আবু বকর (রাঃ) অঙ্গুলির এই অবস্থা দেখে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কাঁধে বসিয়ে দৌড় দিলেন এবং সওর পাহাড়ের গুহায় পৌঁছে নামিয়ে দিলেন। অতঃপর বললেন ঃ সেই আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন, আপনি গুহায় যাবেন না যে পর্যন্ত আমি প্রথম তাতে প্রবেশ না করি। কেননা, গুহায় কোন ইতর প্রাণী থাকলে তাতে আমার ক্ষতি হোক– আপনার না হোক। এ কথা বলে হযরত আবু বকর (রাঃ) গুহার অভ্যন্তরে গেলেন। যখন সেখানে কোন কিছু দেখলেন না, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে তুলে ভিতরে নিয়ে গেলেন। গুহার মধ্যে কিছু ফাটল ছিল, যাতে সর্প ও বিচ্ছু বাস করত। হযরত আবু বকর (রাঃ) ফাটলের মুখে নিজের পা রেখে দিলেন এই আশংকায় যে, কোথাও কোন কিছু বের হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দংশন না করে। ঘটনাক্রমে একটি সর্প হযরত আবু বকরের পায়ে দংশন করল। যন্ত্রণার চোটে অশ্রুতে তাঁর কপোল ভেসে যাচ্ছিল। রসূলে আকরাম (সাঃ) তাঁকে বলছিলেন ঃ হে আবু বকর, لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا 'চিন্তা করো না, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন।' এর পর আল্লাহ্ তাআলা হযরত আবু বকরের জন্যে সান্ত্বনা নাযিল করলেন।

আর একটি ঘটনা শুন হযরত আবু বকরের খেলাফতের প্রথম ভাগে আরবের অনেক লোক ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। তাদের কেউ কেউ বলে, আমরা নামায পড়ব, কিন্তু যাকাত দেব না। তিনি তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার ইচ্ছা করলেন। আমি তাঁকে এ থেকে বিরত রাখার জন্যে তাঁর খেদমতে গেলাম। আমি বললাম ঃ হে নায়েবে রসূল! আপনি মানুষকে বুঝান এবং তাদের প্রতি নম্রতা প্রকাশ করুন। তিনি আমাকে বললেন ঃ আশ্চর্যের বিষয়, কুফরে তুমি এত শক্ত ছিলে আর ইসলামে এত ঢিলে হয়ে গেছ! আমি তাদেরকে কিসের ভিত্তিতে বুঝাব? রসূলুল্লাহ (সাঃ) পরম প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। ওহী বন্ধ হয়ে গেছে। আল্লাহর কসম, যদি লোকেরা আমাকে একটি রশি দিতেও অস্বীকার করে, যা তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দিত, তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করব। এর পর আমরা তাঁর সাথে থেকে জেহাদ করেছি এবং পরিষ্কাররূপে বুঝতে পেরেছি, তিনি সুপথপ্রাপ্ত ছিলেন এবং তাঁর অভিমতই সঠিক। এটা হচ্ছে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর দিনের অবস্থা। এর পর হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) আবু মূসা আশআরীকে তিরস্কার করে লেখে পাঠালেন– তুমি এরূপ কর কেন? দোষ তোমারই।

আসমায়ী বলেন ঃ আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান তার রাজত্বকালে হজ্জ পালন করতে এসে একদিন মক্কায় সিংহাসনে বসলেন। তার চারপাশে প্রত্যেক গোত্রের শীর্ষস্থানীয় সর্দাররা সমবেত ছিল। ঠিক এ সময় হযরত আতা ইবনে আবু রুবাহ্ খলীফার কাছে আগমন করলেন। খলীফা তাঁকে দেখামাত্রই উঠে দাঁড়ালেন এবং সিংহাসনে নিজের পার্শ্বে বসালেন। অতঃপর খলীফা তাঁর সামনে বসে আরজ করলেন ঃ আপনি কেন কষ্ট করে আগমন করেছেন? আতা বললেন ঃ হে আমীরুল মুমেনীন, আল্লাহ তাআলার হেরেম ও তাঁর রসূলের হেরেমের ব্যাপারে সব সময় আল্লাহকে ভয় করবেন। এসব স্থানের অধিবাসীদের খবরাখবর নেবেন। মুহাজির ও আনসারগণের সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবেন। তাদের দৌলতেই আপনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। যারা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষায় নিয়োজিত রয়েছে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করবেন। সাধারণ মুসলমানদের কাজ-কারবারের প্রতি সুনজর রাখবেন। তাদের বিষয়ে বিশেষভাবে আপনিই জিজ্ঞাসিত হবেন। যারা আপনার দ্বারে আগন করে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহর ভয় রাখবেন। তাদের অবস্থা সম্পর্কে গাফেল হবেন না এবং তাদের সামনে আপন দ্বার রুদ্ধ করবেন না, যাতে আপনার কাছে আসতে না পারে। খলীফা আরজ

করলেন ঃ ভাল, আমি আপনার কথামতই কাজ করব। এর পর হযরত আতা প্রস্থানোদ্যত হলে খলীফা তাঁকে ধরে ফেললেন এবং বললেন ঃ হে আবু মুহাম্মদ, এতক্ষণ আপনি অন্যদের বিষয়ে বর্ণনা করেছেন এবং আমি তা পূর্ণ করব বলে ওয়াদা করেছি। এখন নিজের প্রয়োজন ব্যক্ত করুন। তিনি বললেন ঃ মানুষের কাছে আমার কোন প্রয়োজন নেই। এ কথা বলে তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন। আবদুল মালেক বললেন ঃ আভিজাত্য ও মর্যাদা একেই বলে।

কথিত আছে, একদিন ওলীদ ইবনে আবদুল মালেক তার দারোয়ানকে বললেন ঃ দরজায় দাঁড়াও। কেউ এ পথে গেলে তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তার কথাবার্তা শুনব। দারোয়ান দরজায় দাঁড়াল। এমন সময় আতা ইবনে আবু রুবাহ্ সেই পথে যাচ্ছিলেন। দারোয়ান তাঁকে চিনত না। সে বলল ঃ আমীরুল মুমেনীনের কাছে চল। এটা তাঁর আদেশ। আতা খলীফার কাছে গেলেন। তখন হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ)ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আতা ওলীদের নিকটে পৌঁছে বললেন ঃ আসসালামু আলাইকুম হে ওলীদ! খলীফা দারোয়ানের প্রতি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন ঃ হতভাগা, আমি তোকে বলছিলাম এমন ব্যক্তিকে আনতে, যে আমাকে কিস্‌সা-কাহিনী শুনাবে। আর তুই কিনা এমন একজনকে এনেছিস, যে আমাকে সেই নামে ডাকা পছন্দ করে না, যা আল্লাহ তাআলা আমার জন্যে মনোনীত করেছেন (অর্থাৎ, আমীরুল মুমেনীন)। দারোয়ান বলল ঃ এ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ এ পথে আসেনি। এর পর খলীফা আতাকে বললেন ঃ বসুন। কথাবার্তার মধ্যে আতা খলীফার সামনে এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করলেন— জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম হাবাব। আল্লাহ্ তাআলা এটি সেই শাসনকর্তার জন্যে রেখেছেন, যে তার শাসনকার্যে যুলুম করে। এ কথা শুনে খলীফা ওলীদ ভীষণ আর্তচীৎকার করে দেওয়ানখানার মাঝখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) আতা (রঃ)-কে বললেন ঃ আপনি আমীরুল মুমেনীনকে মেরে ফেলেছেন। আতা তাঁর হাত ধরে সজোরে চাপ দিলেন এবং বললেন ঃ হে ওমর, এটা বাস্তব অবস্থা। অতঃপর আতা সেখান থেকে চলে গেলেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয বর্ণনা করতেন ঃ হাতে চাপ দেয়ার প্রভাবে কয়েক বছর পর্যন্ত আমার হাতে ব্যথা ছিল।

প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিক ইবনে আবী শুমায়লা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের কাছে গেলেন। আবদুল মালেক তাঁকে বললেন ঃ কিছু

বলুন। তিনি বললেন ঃ কি বলব, আপনি তো জানেন, বক্তা যে কথা বলে, তা তার জন্যে দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে থাকে, সেই কথা ছাড়া, যা আল্লাহর ওয়াস্তে বলা হয়। আবদুল মালেক কেঁদে উঠলেন; অতঃপর বললেন ঃ আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন, মানুষ তো চিরকালই একে অপরকে উপদেশ দেয়। তিনি বললেন ঃ আমীরুল মুমিনীন, কেয়ামতে কোন মানুষই কথার তিক্ততা গলায় আটকে যাওয়া এবং ধ্বংস প্রত্যক্ষ করা থেকে মুক্তি পাবে না। তবে তারা মুক্তি পাবে, যারা নিজেকে অসন্তুষ্ট করে আল্লাহ্ তাআলাকে সন্তুষ্ট করে। আবদুল মালেক আবার কেঁদে উঠলেন এবং বললেন ঃ আমি এসব অমিয় বাণী আজীবন চিত্রের ন্যায় চোখের সামনে রাখব।

ইবনে আয়েশা বলেন ঃ একবার হাজ্জাজ বসরা ও কুফার আলেমগণকে ডেকে পাঠালে আমরা সকলেই গেলাম। হযরত হাসান বসরী (রঃ) সকলের পশ্চাতে গেলেন। হাজ্জাজ তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে "মারহাবা" বলল এবং একটি চেয়ার আনিয়ে সিংহাসনের কাছে তাঁকে বসাল। অনেক কথাবার্তার পর হাজ্জাজ হযরত আলী (রাঃ)-এর প্রসঙ্গ টেনে তাঁর উদ্দেশে গালিগালাজ করতে লাগল। আমরাও তার কথার সাথে সায় দিচ্ছিলাম। ভয়ে আমরা তার কথা মেনে নেয়া ছাড়া আর কিছু বলছিলাম না। হযরত হাসান বসরী থুতনীর নীচে অঙ্গুলি চেপে চুপচাপ বসে ছিলেন। হাজ্জাজ তাঁকে বলল ঃ আপনি চুপ কেন? তিনি বললেন ঃ আমি কিছু বলতে পারি না। হাজ্জাজ বলল ঃ আপনি আলী সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন। হাসান বসরী বললেন ঃ আমি শুনেছি, আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন—

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ -

"যে কেবলার উপর আপনি এতদিন ছিলেন, তাকে আমি এ জন্যেই নির্দিষ্ট করেছিলাম, যাতে কে রসূলের অনুসরণ করে এবং কে করে না তা জেনে নেই। আল্লাহ্ যাদের হেদায়াত করেছেন, তাদের ছাড়া অন্যদের উপর এটা নিঃসন্দেহে গুরুতর ব্যাপার ছিল। আল্লাহ তোমাদের ঈমান বিনষ্ট করবার নন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অনুকম্পাশীল, দয়ালু।"

হযরত আলী মোর্তাযা (রাঃ) সেই ঈমানদার লোকদের একজন ছিলেন, যাঁদেরকে আল্লাহ্ তাআলা হেদায়াত দান করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে আমার মতামত হচ্ছে, তিনি রসূলে করীম (সাঃ)-এর চাচাতো ভাই, তাঁর জামাতা এবং তাঁর সর্বাধিক প্রিয়জন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর জন্যে যেসব শ্রেষ্ঠত্ব পূর্ব থেকে লেখে দিয়েছিলেন, তা সমস্তই তাঁর অর্জিত। তোমার পক্ষে এবং অন্য কারও পক্ষে এটা সম্ভবপর নয় যে, তুমি তাঁর এসব শ্রেষ্ঠত্ব বিলুপ্ত করে দেবে অথবা এগুলোর মধ্যে ও তাঁর মধ্যে অন্তরায় হয়ে যাবে। এটাও আমার অভিমত যে, যদি হযরত আলী মোর্তাযা (রাঃ) কোন মন্দ কাজ করেনও, তবে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কাছ থেকে হিসাব নেবেন। আমার মতে তাঁর সম্পর্কে এর চেয়ে উত্তম উক্তি নেই। এ কথা শুনে হাজ্জাজ নাক সিট্‌কিয়ে ক্রুদ্ধ অবস্থায় সিংহাসন থেকে নেমে পড়ল এবং পশ্চাতের একটি কক্ষে চলে গেল। আমরা সকলেই বেরিয়ে এলাম। সুপ্রসিদ্ধ আলেম আমের শা'বী বলেন ঃ আমি হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর হাত ধরে বললাম, হে আবু সায়ীদ, আপনি হাজ্জাজকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছেন এবং তার সিনা বিদ্বেষে ভরে দিয়েছেন। হাসান বসরী (রঃ) বললেন ঃ হে আমের, আমার কাছ থেকে সরে যাও। লোকে বলে, আমের শা'বী কুফার আলেম, কিন্তু তুমি একজন শয়তান প্রকৃতির মানবরূপী শাসকের কাছে এসে তার মর্জি মোতাবেক কথা বল এবং তার মতামতকে সঠিক বল। ধিক তোমার প্রতি! তুমি আল্লাহকে ভয় করনি। তোমাকে যখন জিজ্ঞেস করা হল, তখন তুমি সত্য বলতে, না হয় চুপ থাকতে। তা হলে শাস্তি থেকে বেঁচে যেতে। আমের জওয়াব দিলেন ঃ আমি তার কথায় সায় দিয়েছি ঠিক, কিন্তু আমি জানতাম, তার কথায় অনিষ্ট আছে। হাসান বসরী বললেন ঃ এটা তোমার বিরুদ্ধে গোনাহের আরও বড় প্রমাণ।

অন্য একদিনের ঘটনা। আমের বলেন ঃ হাজ্জাজ হযরত হাসান বসরীকে ডেকে পাঠাল। তিনি উপস্থিত হলে হাজ্জাজ বলল ঃ আপনিই কি বলেন যে, সেই শাসক নিপাত যাক, যে আল্লাহর বান্দাদেরকে হত্যা করেছে? তিনি বললেন ঃ হাঁ, আমি বলি। সে বলল ঃ এর কারণ কি? তিনি বললেন ঃ এর কারণ, আল্লাহ্ তাআলা আলেমদের কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, তারা কোন কিছু গোপন করবে না– মানুষের কাছে বর্ণনা করে দেবেন। এরশাদ হয়েছে–

وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ۔

'স্মরণ কর যখন আল্লাহ্ কিতাবওয়ালাদের (অর্থাৎ আলেমদের) কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিলেন যে, তোমরা এই কিতাব অবশ্যই মানুষের কাছে বর্ণনা করবে এবং একে গোপন করবে না।'

হাজ্জাজ বলল ঃ ব্যস, বেশী কথা বলবেন না। রসনা সংযত করুন। খবরদার, ভবিষ্যতে যেন এমন কথাবার্তা আর না শুনি, যা আমার কাছে খারাপ লাগে। নতুবা আপনার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেব।

কথিত আছে, হাতীত যাইয়াত হাজ্জাজের সম্মুখে নীত হলে হাজ্জাজ তাঁকে জিজ্ঞেস করল ঃ কি হে, তুমিই নাকি হাতীত যাইয়া!? তিনি বললেন ঃ হাঁ, আমিই হাতীত। তোমার মনে যা চায় জিজ্ঞেস কর। আমি মকামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্ তাআলার সাথে তিনটি অঙ্গীকার করেছি– (১) আমাকে প্রশ্ন করা হলে আমি সত্য জওয়াব দেব, (২) বিপদ হলে সবর করব এবং (৩) নিরাপদ থাকলে শোকর করব। হাজ্জাজ বলল ঃ তুমি আমার সম্পর্কে কি বল? তিনি বললেন ঃ আমি বলি, তুমি পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্ তাআলার অন্যতম দুশমন। তুমি মানুষের মানহানি কর এবং অপবাদ লাগিয়ে হত্যা কর। সে বলল ঃ আমীরুল মুমেনীন আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান সম্পর্কে তোমার অভিমত কি? তিনি বললেন ঃ সে অপরাধে তোমাকেও ছাড়িয়ে গেছে। তুমিই তার সকল অপরাধের মধ্যে এক অপরাধ। হাজ্জাজ আদেশ দিল– একে শাস্তি দাও। সেমতে তাঁর শরীরে বাঁশের চোকলা লাগিয়ে তাঁকে মাটিতে হেঁচড়ানো হল। ফলে দেহের মাংস খসে গেল, কিন্তু তিনি উহ পর্যন্ত করলেন না। হাজ্জাজকে বলা হল, হাতীত এখন মরণোন্মুখ অবস্থায় রয়েছে। এতে ইতর হাজ্জাজ বলল ঃ তাকে তুলে বাজারে নিক্ষেপ কর। জা'ফর বলেন ঃ আমি এবং তার একজন সঙ্গী তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম ঃ হাতীত, তোমার কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কি? তিনি বললেন ঃ আমাকে পানি পান করাও। আমরা পানি এনে দিলাম। তিনি পানির সাথে সাথে মৃত্যুর পেয়ালাও পান করে নিলেন। তাঁর বয়স ছিল আঠার। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

কথিত আছে, গভর্নর আমর ইবনে হুবায়রা একবার বসরা, কুফা, মদীনা ও সিরিয়ার আলেমগণকে একত্রিত করে নানাবিধ প্রশ্ন করল এবং আমের শা'বীর সাথেও আলোচনা করল। সে তাঁকে জিজ্ঞাসিত বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিফহাল পেল। এর পর হাসান বসরীকেও পরখ করার পর বলল ঃ কুফা ও বসরার আলেম এঁরা দুজনই। অতঃপর সকলকে বিদায় দিয়ে শা'বী ও হাসান বসরীকে একান্তে নিয়ে গেল। সে আমের

শা'বীকে লক্ষ্য করে বলল ঃ হে আবু আমর, আমি আমীরুল মুমেনীনের পক্ষ থেকে ইরাকের গভর্নর, তার বিশ্বাসভাজন এবং তার আনুগত্যে আদিষ্ট। প্রজাদের কাজ আমার হাতে সোপর্দ এবং তাদের হক আমার উপর অপরিহার্য। আমি চাই তারা সকল বিপদাপদ থেকে হেফাযতে থাকুক। আমি তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। এর পর দেশবাসীর কাছ থেকে আমি এমন কথা শুনি, যাতে তাদের প্রতি আমার রাগ হয়। এতে আমি তাদের ভাতা মওকুফ করে বায়তুল মালে রেখে দেই। নিয়ত এই থাকে যে, পরে ফেরত দিয়ে দেব, কিন্তু ইতিমধ্যে আমীরুল মুমেনীন এজীদ জানতে পারেন এবং আমাকে লেখে পাঠান, এই অর্থ আর ফেরত দিয়ো না। এখন আমি খলীফার আদেশ অমান্যই করি কিভাবে এবং পালনই করি কিরূপে? অথচ আমি আনুগত্যেই আদিষ্ট। প্রশ্ন হচ্ছে, এ ধরনের ব্যাপারে আমার গোনাহ হবে কি না? আমি আমার নিয়তের অবস্থা বলেই দিয়েছি। শা'বী জওয়াব দিলেন ঃ আল্লাহ তাআলা আপনাকে পুণ্য দান করুন। বাদশাহ্ পিতৃতুল্য। তিনি ভুল-নির্ভুল উভয় প্রকার কাজ করেন। এ জন্যে আপনাকে পাকড়াও করা হবে না। ইবনে হুবায়রা এ জওয়াব শুনে খুবই আনন্দিত হল এবং বলল ঃ আল্লাহর শোকর, আমাকে পাকড়াও করা হবে না। এর পর ইবনে হুবায়রা হাসান বসরীকে সম্বোধন করে বলল ঃ হে আবু সায়ীদ, আপনি কি বলেন? তিনি বললেন ঃ আমি আপনার কথা শুনেছি, আপনি আমীরুল মুমিনীনের গভর্নর, তার বিশ্বস্ত এবং আনুগত্যে আদিষ্ট। প্রজাদের মঙ্গল সাধন আপনি অপরিহার্য মনে করেন। বাস্তবে প্রজাদের হক আপনার জন্যে অপরিহার্য এবং তাদের হিতাকাঙ্ক্ষা আপনার উপর ওয়াজিব। আমি আবদুর রহমান ইবনে সামরা কারশী সাহাবীর মুখে শুনেছি রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ যেব্যক্তি প্রজাদের শাসক হয়ে শুভেচ্ছা সহকারে তাদের হেফাযত করে না, আল্লাহ্ তাআলা তার উপর জান্নাত হারাম করে দেবেন। আপনি আরও বলেছেন, আপনি কখনও কখনও প্রজাদের ভাতা বাজেয়াপ্ত করে দেন এবং এতে তাদের হিতসাধন ও আনুগত্য নিয়ত থাকে। কিন্তু এজীদ তা জেনে ফেলে এবং সেই অর্থ ফেরত না দেয়ার আদেশ জারি করে। তখন তার আদেশ পালন করবেন, না প্রত্যাখ্যান করবেন, তা আপনি ভেবে পান না। আমি বলি, আপনার জন্যে এজীদের হকের তুলনায় আল্লাহ্ তাআলার হক অধিক অপরিহার্য। আল্লাহ তাআলার আদেশ মান্য করা একটি হক। তাঁর অবাধ্যতা করে কোন মানুষের আনুগত্য করা উচিত নয়। সুতরাং আপনি এজীদের লিখিত আদেশ কোরআনের সামনে পেশ করুন। যদি একে আল্লাহ

তাআলার আদেশের অনুকূলে পান, তবে বাস্তবায়ন করুন। আর বিরুদ্ধে পেলে পিঠের পশ্চাতে নিক্ষেপ করুন। হে ইবনে হুবায়রা, আল্লাহকে ভয় করুন। অচিরেই তাঁর দূত আপনার কাছে আসবে এবং আপনাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেবে। এই সুপ্রশস্ত প্রাসাদ থেকে বের করে আপনাকে সংকীর্ণ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন কবরে পৌঁছে দেবে। এই রাজত্ব ও পৃথিবীর সবকিছু আপনি পেছনে ফেলে যাবেন এবং আল্লাহ তাআলার সামনে যেমন কর্ম তেমন ফল পাবেন। হে ইবনে হুবায়রা, আল্লাহ আপনাকে এজীদের কবল থেকে রক্ষা করুন, কিন্তু এজীদের সাধ্য নেই, আপনাকে আল্লাহর কবল থেকে রক্ষা করতে পারে। আল্লাহ তাআলার আদেশ সকল আদেশের উর্ধ্বে। তাঁর নাফরমানী করে কারও আনুগত্য করার বিধান নেই। আমি আপনাকে আল্লাহর সেই আযাব থেকে সতর্ক করছি, যা পাপীদের থেকে প্রত্যাহার করা হয় না। ইবনে হুবায়রা বলল ঃ হে শায়খ, ছোট মুখে বড় কথা বলবেন না। আমীরুল মুমেনীন তো শাসক, জ্ঞানী ও গুণী। আল্লাহ তাআলা তাকে উম্মতের শাসক নিযুক্ত করেছেন কিছু বুঝেই এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব ও নিয়ত দেখেই। অতএব তার সমালোচনা করবেন না।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বললেন ঃ হে ইবনে হুবায়রা, হিসাব তোমার মাথার উপরে এবং বেত্রের বদলে বেত্র। আল্লাহ তাআলা ওৎ পেতে আছেন। জেনে রাখ, যেব্যক্তি তোমাকে উপদেশ দেয় এবং আখেরাতের প্রতি উৎসাহিত করে, সে তার চেয়ে উত্তম, যে তোমাকে বিভ্রান্ত করে এবং মিথ্যা আশ্বাস দেয়। ইবনে। হুবায়রা এ কথা শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করল। শা'বী বলেন ঃ আমি হযরত হাসান বসরীকে বললাম, আপনি ইবনে হুবায়রাকে উত্তেজিত করে দিয়েছেন। ফলে তার কাছ থেকে যে দান পাওয়ার আশা ছিল, তা থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম। তিনি বললেন ঃ হে আমের শা'বী, দূর হয়ে যাও এখান থেকে। এমন সর্বনাশা কথা বলো না। শা'বী বলেন ঃ এর পর হযরত হাসান বসরীর জন্যে উপঢৌকন এল। তাঁর সম্মান বৃদ্ধি পেল, কিন্তু আমি কিছুই পেলাম না। বাস্তবে তাঁর সাথে যে ব্যবহার করা হল, তিনি তারই উপযুক্ত ছিলেন এবং আমার সাথে যা করা হল, আমি তারই যোগ্য ছিলাম। আমি যত আলেম দেখেছি, হাসান বসরীর মত কাউকে দেখিনি। যখনই কোন সমাবেশে আমরা একত্রিত হয়েছি, তিনি আমাদের সকলের উপর বিজয়ী হয়েছেন। কারণ, তিনি আল্লাহর জন্যে কথা বলেছেন, আর আমরা শাসকদের মন তুষ্ট করার জন্যে বলেছি। আমি সেদিন থেকে

প্রতিজ্ঞা করেছি, কোন শাসকের কাছে তার পক্ষপাতিত্ব করার জন্যে যাব না।

ইমাম শাফেয়ী বলেন ঃ আমার চাচা মুহাম্মদ ইবনে আলী বলেছেন– একবার আমি খলীফা আবু জা'ফর মনসুরের দরবারে ছিলাম। সেখানে ইবনে আবী যীব এবং মদীনার গভর্নর হাসান ইবনে যায়দও উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় গেফার গোত্রের লোকজন সেখানে আগমন করল। তারা খলীফার কাছে হাসান ইবনে যায়দের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ করলে হাসান বললেন ঃ আমীরুল মুমেনীন, ইবনে আবী যীবের কাছে জিজ্ঞেস করুন। খলীফা জিজ্ঞেস করলে ইবনে আবী যীব বললেন ঃ এরা মানুষের মানহানি করে এবং মানুষকে খুব কষ্ট দেয়। খলীফা গেফারীদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ তোমরা শুনলে তো তিনি কি বললেন? গেফারীরা বলল ঃ আপনি তার কাছে হাসান ইবনে যায়দের অবস্থাও জিজ্ঞেস করুন। খলীফা জিজ্ঞেস করলে ইবনে আবী যীব বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, তিনি অন্যায় আদেশ দেন এবং স্বীয় খেয়ালখুশীর অনুসরণ করেন। খলীফা হাসানকে বললেন ঃ তুমি তো শুনলে তোমার সম্পর্কে কি রিপোর্ট হল। ইবনে আবী যীব সরল ও সাধু মানুষ। হাসান বললেন ঃ আমীরুল মুমেনীন, তাঁকে আপনার নিজের অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করুন। খলীফা জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি আমার সম্পর্কে কি অভিমত পোষণ করেন? তিনি বললেন ঃ এ ব্যাপারে আমাকে ক্ষমা করুন। খলীফা বললেন ঃ আপনাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি, অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন ঃ আপনি কসম দিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, যেন নিজের সম্পর্কে কিছুই জানেন না। খলীফা পীড়াপীড়ি করলে তিনি বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি এই ধন-সম্পদ ন্যায়ভাবে গ্রহণ করেননি– অন্যায়ভাবে গ্রহণ করেছেন এবং এমন লোকদের জন্যে ব্যয় করেছেন, যারা এর যোগ্য ছিল না। আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে, যুলুম অবিচার আপনার দরজায় বিস্তৃতি লাভ করেছে। এ কথা শুনে খলীফা মনসুর আপন স্থান থেকে সরলেন এবং ইবনে আবী যীবের ঘাড়ে হাত রেখে বললেন ঃ মনে রাখবেন, যদি আমি এখানে না বসতাম, তবে পারসিক, রোমীয় ও তুর্কীরা এ স্থান আপনার হাত থেকে ছিনিয়ে নিত। ইবনে আবী যীব বললেন ঃ আমীরুল মুমেনীন, হযরত ওমরও শাসক ছিলেন। তিনি ন্যায়ভাবে অর্থ সংগ্রহ করেছেন এবং সমান বন্টন করেছেন। তারা পারস্য ও রোমের ঘাড়ে ধরে তাদের নাক মাটিতে ঘষে দিয়েছেন। মনসুর ইবনে আবী যীবের ঘাড় ছেড়ে দিলেন এবং এ কথা বলে বিদায় দিলেন– আপনি সত্য কথা বলেন,

এটা আমার জানা না থাকলে আমি অবশ্যই আপনাকে হত্যা করতাম। ইবনে আবী যীব বললেন ঃ আল্লাহর কসম হে আমীরুল মুমেনীন, আপনার পুত্র মাহ্দীর চেয়েও আমি আপনার অধিক হিতাকাঙ্ক্ষী। ইবনে আবী যীব মনসুরের মজলিস থেকে বের হলে পর সুফিয়ান সওরীর সাথে সাক্ষাৎ হল। সুফিয়ান বললেন ঃ আপনি এই যালেমের সাথে যেভাবে কথা বলেছেন, তাতে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি, কিন্তু কথাটি আমার কাছে খারাপ লেগেছে যে, আপনি তার পুত্রকে "মাহ্দী" (হেদায়াতপ্রাপ্ত) বলেছেন। আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন। ইবনে আবী যীব বললেন ঃ আমি তাকে "হেদায়াতপ্রাপ্ত" অর্থে মাহদী বলিনি; বরং সকল মানুষ মাহ্দীর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত বিধায় মাহদী বলেছি।

আবদুর রহমান ইবনে আমর আওযায়ী (রহঃ) বলেন ঃ আমি সমুদ্রোপকূলে ছিলাম। খলীফা মনসুর লোক পাঠিয়ে আমাকে সেখান থেকে নিয়ে এল। আমি দরবারে পৌঁছে খেলাফতের রীতি অনুযায়ী সালাম করলাম। খলীফা সালামের জওয়াব দিয়ে আমাকে বসতে বলল। আমি বসতেই সে বলল ঃ অনেক দিন হয় আপনি আমার কাছে আসেন না, এর কারণ কি? আমি বললাম ঃ আমার কাছে আপনার প্রয়োজন কি? সে বলল ঃ কিছু শিখতে চাই। আমি বললাম ঃ আমীরুল মুমেনীন, তা হলে আমি যা বলব তা মনে রাখবেন– ভুলে যাবেন না। খলীফা বলল ঃ আমি নিজেই যখন জিজ্ঞেস করছি, তখন ভুলে যাব কেন? এ প্রয়োজনেই আমি আপনার কাছে লোক পাঠিয়েছি। আমি বললাম ঃ আমার আশংকা হয়, আপনি শুনবেন, কিন্তু তদনুযায়ী কাজ করবেন না। আমি একথা বলতেই রবী আমাকে হুশিয়ার করে দিল এবং তরবারির কবজায় হাত রাখল। খলীফা তাকে শাসিয়ে বলল ঃ এটা সওয়াবের মজলিস– শাস্তির মজলিস নয়। এতে আমার মন প্রফুল্ল হয়ে গেল এবং কথা বলার জন্যে মনের কপাট খুলে গেল। আমি বললাম ঃ আমীরুল মুমেনীন, আমি মকহুলের কাছ থেকে এবং তিনি আতিয়্যা ইবনে বুসরের কাছ থেকে বর্ণনা করেন, রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেছেন– যে বান্দার কাছে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ধর্ম সম্পর্কে কোন উপদেশ আসে, সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত এক নেয়ামত বৈ নয়। সে যদি সেটা কৃতজ্ঞতা সহকারে কবুল করে নেয়, তবে উত্তম। নতুবা সেটাই আল্লাহর পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ হবে, যাতে এর কারণে তার গোনাহ্ বেশী হয় এবং আল্লাহ্ এর কারণে তার প্রতি বেশী নারাজ হন। আমীরুল মুমেনীন, আমি মকহুলের কাছ থেকে এবং তিনি আতিয়্যা থেকে বর্ণনা করেন,

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন– যে শাসক প্রজাদের অহিতকামী হয়ে মারা যাবে, আল্লাহ্ তাআলা তার উপর জান্নাত হারাম করে দিবেন। আমীরুল মমেনীন, আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার সত্য। তিনি আপনার প্রজাদের অন্তর আপনার প্রতি নরম করে দিয়েছেন এবং আপনাকে শাসনক্ষমতা দান করেছেন। কারণ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে আপনার আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে যিনি উম্মতের প্রতি অনুকম্পাশীল, দয়ালু, মনে প্রণে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং আল্লাহ ও উম্মতের কাছে প্রসংসনীয় ছিলেন। অতএব আপনারও উচিত আল্লাহর ওয়াস্তে উম্মতের মধ্যে সত্য কায়েম করা, ন্যায়বিচার সহকারে থাকা, তাদের দোষ গোপন করা, ফরিয়াদীর ফরিয়াদ শ্রবণ করা, তাদের জন্যে ফটক বন্ধ না করা, তাদের সুখে সুখী এবংর দুঃখে দুঃখী হওয়া। আমীরুল মুমেনীন, পূর্বে আপনার কেবল নিজের চিন্তা ছিল; এখন সকল মানুষের বোঝা আপনার কাঁধে। আরব ও আজম এবং কাফের ও মুসলিম আপনার করায়ত্ত। আপনার ন্যায়পরায়ণতায় তাদের প্রত্যেকের অংশ আছে। যখন তারা দলে দলে দাঁড়াবে এবং কেউ আপনার তরফ থেকে বিপদে ফেলার অভিযোগ করবে এবং কেউ কোন হক আত্মসাৎ করার অভিযোগ করবে, তখন আপনার কি অবস্থা হবে? হে আমীরুল মমেনীন, আমি মকহুলের কাছ থেকে শুনেছি তিনি ওরওয়া ইবনে রোয়ায়মের কাছ থেকে বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (সাঃ)-এর পবিত্র হাতে একটি খর্জূর শাখা ছিল, যদ্দ্বারা তিনি মেসওয়াক করতেন এবং মোনাফেকদেরকে সতর্ক করতেন। তাঁর কাছে হযরত জিবরাঈল আগমন করে আরজ করলেন ঃ হে মুহাম্মদ! এই শাখা কিসের? এর দ্বারা আপনি আপনার উম্মতের মন ভেঙ্গে দিয়েছেন এবং তাদেরকে সন্ত্রস্ত করে দিয়েছেন। অতএব যে ব্যক্তি উম্মতের পিঠের চামড়া তুলে দেয়, তাদের রক্ত প্রবাহিত করে; তাদের শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে এবং তাদেরকে দেশান্তরিত করে দেয়, তার কি দশা হবে? হে আমীরুল মুমেনীন আমি মকহুল থেকে তিনি সিয়াদা থেকে, তিনি হারেসা থেকে এবং হারেসা হাবীব ইবনে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর নিজের কাছ থেকে "কেসাস" (প্রতিশোধ) নিতে বললেন। অর্থাৎ, তাঁর হাত দিয়ে অজ্ঞাতসারে জনৈক বেদুঈনের গায়ে বেত লেগেছিল। তৎক্ষণাৎ জিব্রাঈল তাঁর কাছে এসে আরজ করলেন ঃ হে মুহাম্মদ! আল্লাহ তাআলা আপনাকে যালেম ও অহংকারীরূপে পেরণ করেননি। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বেদুঈনকে ডাকলেন এবং বললেন ঃ আমার কাছ থেকে প্রতিশোধ নাও। বেদুঈন বলল ঃ আমি আপনাকে ক্ষমা করে

দিয়েছি। আপনার প্রতি আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক। আমি এমন নই। আপনি যদি আমাকে প্রাণে মেরে ফেলতেন, তবু আমি 'কেসাস' নিতাম না। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তার জন্যে দোয়া করলেন। হে আমীরুল মুমেনীন, নিজের উপকারের জন্যে অধ্যবসায় করুন এবং পরওয়ারদেগারের কাছে শান্তি প্রার্থনা করুন। সেই জান্নাতে আগ্রহী হোন, যার প্রস্থ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমান এবং যার শানে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের কারও জন্যে জান্নাত থেকে এক ধনুক পরিমাণে অর্জিত হওয়া পৃথিবী ও পৃথিবীস্থিত সবকিছু থেকে উত্তম। হে আমীরুল মুমেনীন! যদি রাজত্ব আপনার পুর্ববর্তীদের জন্যে চিরস্থায়ী থাকত, তবে আপনি তা পেতেন না। এমনিভাবে আপনার কাছেও থাকবে না; যেমন অন্যদের কাছে থাকেনি। হে আমীরুল মুমেনীন! আপনি জানেন, আপনার পিতামহ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে–

مَا لِهٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّآ اَحْصٰهَا ۔

এ কোরআনের কি হল, সগীরা-কবীরা কোন গোনাহ্ই গণনা না করে ছাড়ে না ?

কোরআনের এ আয়াত সম্পর্কে তিনি বলেন, এখানে সগীরা অর্থ মুচকি হাসা এবং কবীরা অর্থ হাসা। অতএব যখন মুচকি হাসা ও পূর্ণ হাসা সগীরা এবং কবীরা গোনাহ্ সাব্যস্ত হল, তখন হাতের কাজ ও মুখের উক্তিসমূহের কি অবস্থা হবে? হে আমীরুল মুমেনীন! আমি শুনেছি হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) বলেছেন– যদি কোন ছাগল ছানা ফোরাতের কিনারে অনাহারে মারা যায়, তবে আমি আশংকা করি এ সম্পর্কে না আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়। এখন বলুন, যারা আপনার বিছানায়ই থাকে এবং আপনার ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত থাকে, তার হিসাব আপনাকে দিতে হবে না কি? হে আমীরুল মুমেনীন! আপনি জানেন আপনার পিতামহ নিম্নোক্ত আয়াতের কি তফসীর করেছেন?

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۔

হে দাউদ, আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা করেছি। অতএব তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তাহলে খেয়াল-খুশী তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে।

তিনি বলেন– আল্লাহ্ তাআলা যবুর কিতাবে এরশাদ করেছেন, যখন বাদী ও বিবাদী তোমার সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং তোমার মনে তাদের

একজনের প্রতি ঝোঁক থাকে তখন কখনও একথা চিন্তা করো না যে, হক সে-ই লাভ করুক এবং বিজয়ী সে-ই হোক । যদি এরূপ চিন্তা কর, তবে আমি তোমার নাম নবুওয়তের দফতর থেকে কেটে দেব। এর পর তুমি আমার খলীফাও থাকবে না এবং কোন মাহাত্ম্যও পাবে না । হে দাউদ, আমি আমার রসূলগণকে উটের রাখালের মত করেছি। রাখালরা পথঘাট সম্পর্কে সম্যক অবগত থাকে এবং শাসন নরমভাবে করে। মোটা উটকে বেঁধে রাখে এবং দুর্বল ও কৃশ উটের সামনে ঘাস পানি দেয়। হে আমীরুল মুমেনীন, আপনি এমন দায়িত্বের সাথে জড়িত আছেন, যদি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সামনে তা পেশ করা হত, তবে তারা ভয়ে তা বহন করতে অস্বীকার করত। দেখুন, আমার কাছে এযীদ ইবনে জাবের ও তাঁর কাছে আবদুর রহমান ইবনে ওমর আনসারী বর্ণনা করেছেন, হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) জনৈক আনসারীকে যাকাত আদায়কারী নিযুক্ত করেন। কয়েকদিন পর তিনি দেখলেন, সে কাজে যোগদান করেনি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ ব্যাপার কি, তুমি তোমার কর্মস্থলে গেলে না কেন? তুমি কি জান না, তুমি আল্লাহর পথে জেহাদকারীর অনুরূপ সওয়াব পাবে? সে বলল ঃ কি করব, সাহস পাই না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কেন? আনসারী বলল ঃ আমি শুনেছি, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, যেব্যক্তি মুসলমানদের কোন কাজের কর্মকর্তা নিযুক্ত হবে, কেয়ামতের দিন তাকে ঘাড়ে হাতবাঁধা অবস্থায় উপস্থিত করা হবে। একমাত্র ন্যায়বিচার ছাড়া অন্য কিছু তার হাত খুলতে পারবে না। এর পর তাকে জাহান্নামের পুলের উপর খাড়া করা হবে। পুল তাকে এমনভাবে নাড়া দেবে যে, তার গ্রন্থিসমূহ আপন স্থান থেকে সরে যাবে। এর পর পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে এবং হিসাবে-নিকাশ করা হবে। যদি সৎকর্মী হয় তবে সংকর্মের কারণে বেঁচে যাবে। আর কুকর্মী হলে পুল সেই স্থান থেকে বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং সে জাহান্নামে সত্তর বছর দূরত্বে নীচে পতিত হবে। হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি এই হাদীস কার কাছে শুনেছ? সে বলল ঃ হযরত আবু যর ও সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর কাছে। তিনি লোক পাঠিয়ে তাঁদের উভয়কে ডেকে আনলেন এবং হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা বললেন ঃ নিঃসন্দেহে আমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মুখে এ হাদীসটি শুনেছি। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ হায়, হায়, শাসনকার্যে এত অনিষ্ট থাকলে এ কাজ কে করবে? হযরত আবু যর (রাঃ) বললেন ঃ সে-ই করবে, যার নাক আল্লাহ তা'আলা কেটে দেন এবং গণ্ড মাটিতে মিশিয়ে দেন। আওযায়ী বলেন ঃ এ পর্যন্ত শুনে মনসুর

মুখে রুমাল দিয়ে এত কাঁদল যে, আমাকেও কাঁদিয়ে দিল । আমি বললাম ঃ হে আমীরুল মুমেনীন, আপনার প্রপিতামহ হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে মক্কা, তায়েফ অথবা ইয়ামনের শাসনক্ষমতা চেয়েছিলেন। জওয়াবে তিনি এরশাদ করেছিলেন ঃ চাচাজান, যদি আপনি নিজেকে কষ্ট থেকে দূরে রাখেন, তবে এটা সেই রাজত্ব থেকে উত্তম যা আপনি বেষ্টন করতে পারবেন না। পিতৃব্যের হিতাকাঙ্ক্ষায়ই তিনি একথা বলছিলেন। হযরত আব্বাসকে তিনি আরও বলছিলেন– আল্লাহ্ তাআলার সামনে আমি আপনার কোন উপকার করতে পারব না। যখন وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ (আপনি আপনার নিকটআত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন।) আয়াতখানি নাযিল হয়, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আব্বাস, সফিয়্যা ও ফাতেমা যাহরা (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বললেন ঃ আমি তোমাদের কোন উপকারে আসব না। আমার কর্ম আমার জন্যে এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্যে উপকারী হবে।

হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন ঃ বুদ্ধিদীপ্ত সৎকর্মী ব্যক্তিই শাসনকার্য পরিচালনা করতে সক্ষম হবে। তার কোন দোষ যাহির না হওয়া চাই; আত্মীয়-তোষণ করবে বলে আশংকা না থাকা চাই এবং ধর্মীয় ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারেও প্রভাবিত না হওয়া চাই। তিনি আরও বলেন ঃ শাসক চার প্রকার। (১) যে নিজেও পরিশ্রম করে এবং কর্মচারীদের কাছ থেকেও পরিশ্রম নেয়। সে আল্লাহর পথে জেহাদকারীর মত। তার উপর আল্লাহর রহমতের হাত প্রসারিত থাকে। (২) যে কিছুটা দুর্বল। নিজে পরিশ্রম করে, কিন্তু কর্মচারীরা অলসতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। আল্লাহ তা'আলা রহমত না করলে সে ধ্বংসের মুখোমুখি! (৩) যে কর্মচারীদের কাছ থেকে পরিশ্রম নেয়; কিন্তু নিজে অলসতা করে। এরূপ শাসক একাই ধ্বংস হয়ে যায়। (৪) যে নিজেও অলসতা করে এবং কর্মচারীরাও তাই করে। এখানে সকলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। হে আমীরুল মুমেনীন! আমি শুনেছি, হযরত জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করলেন ঃ আমি যখন আপনার কাছে আগমন করেছি, তখন কেয়ামতে প্রজ্বলিত করার জন্য ইন্ধন দোযখের অগ্নির উপর রেখে দেয়া হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আমার কাছে দোযখের অবস্থা বর্ণনা করুন । জিবরাঈল বললেন ঃ আল্লাহ তাআলা দোযখ প্রজ্বলিত করার আদেশ দিলে হাজার বছর পর্যন্ত তা প্রজ্বলিত করা হয়। ফলে দোযখ রক্তবর্ণ ধারণ করে। এর পর আরও

হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্বলিত করা হয়। ফলে তা পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে। এর পর আরও হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্বলিত করা হলে তা কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যায়। এখন দোযখ ঘোর কাল ও অন্ধকারময়। ফলে তার পুল দৃষ্টিগোচর হয় না এবং অগ্নিশিখাও নির্বাপিত হয় না। সেই আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করেছেন, যদি দোযখীদের একটি বস্ত্রও পৃথিবীবাসীদেরকে দেখানো হয়, তবে সকলেই মারা যাবে এবং যদি দোযখের এক বালতি পানি পৃথিবীর সব পানির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়, তবে যে কেউ সেই পানি পান করবে, সে তৎক্ষণাৎ মারা যাবে। কোরআনে উল্লিখিত দোযখের শিকলসমূহের মধ্য থেকে যদি একটি শিকল পৃথিবীর সকল পাহাড়ের উপর রেখে দেয়া হয়, তবে সকল পাহাড় গলে তরল হয়ে যাবে। যদি কোন ব্যক্তিকে দোযখে দাখিল করার পর বের করে দুনিয়াতে আনা হয়, তবে তার দুর্গন্ধে, ভয়ে ও কুৎসিত চেহারা দেখে সকল মানুষ মারা যাবে। এ অবস্থা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং জিবরাঈলও তাঁর সাথে ক্রন্দন করলেন। এর পর জিবরাঈল আরজ করলেন ঃ হে মুহাম্মদ, আপনার তো আগে পরের সকল গোনাহ্ মাফ হয়ে গেছে, আপনি কাঁদেন কেন? তিনি বললেন ঃ আমার কান্না কৃতজ্ঞতার কান্না, কিন্তু আপনি তো বিশ্বস্ত আত্মা এবং আল্লাহ্ তাআলার ওহীর আমানতদার ফেরেশতা, আপনি কাঁদলেন কেন? জিবরাঈল আরজ করলেন ঃ আমি আশংকা করি, আমার অবস্থা কোথাও হারুত মারুতের মত না হয়ে যায়। তাই আমি আমার মর্যাদার উপর ভরসা পাই না। মোট কথা, তাঁদের অবিরাম ক্রন্দনে আকাশ থেকে ঘোষণা করা হল, হে জিবরাঈল, হে মুহাম্মদ, আমি তোমাদের উভয়কে এ বিষয় থেকে নিরাপদ করে দিয়েছি যে, তোমরা আমার নাফরমানী করবে এবং আমি তোমাদেরকে আযাব দেব। মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সকল পয়গম্বরের উপর এমন, যেমন জিবরাঈলের শ্রেষ্ঠত্ব সকল ফেরেশতার উপর। আমীরুল মুমেনীন! আমি আরও শুনেছি, হযরত ওমর (রাঃ) দোয়া করেছিলেন– ইলাহী! বাদী বিবাদীর মধ্য থেকে যে অন্যায় করে, সে আমার নিকটাত্মীয় হোক বা না হোক, যদি তুমি জান আমি তার পক্ষপাতিত্ব করি, তবে আমাকে এক মুহূর্তও সময় দিয়ো না। আমীরুল মুমেনীন, মানুষের মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার হক আদায় করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। আল্লাহ্ তাআলার কাছে সর্বাধিক মাহাত্ম্য হচ্ছে তাকওয়া। যেব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে ইযযত ও সম্মান কামনা করে, তাকে আল্লাহ্ তাআলা উঁচু করেন এবং সম্মান দান করেন। পক্ষান্তরে যে আল্লাহর নাফরমানী করে সম্মান তলব করে, আল্লাহ্ তাকে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত করেন। এ হচ্ছে আপনার প্রতি আমার উপদেশ, ওয়াসসালামু আলাইকুম। এর পর আমি প্রস্থানোদ্যত হলাম। মনসুর জিজ্ঞেস করল ঃ কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা রাখেন? আমি বললাম ঃ আমীরুল মুমেনীন অনুমতি দিলে দেশে বাল-বাচ্চাদের কাছে যাব ইনশাআল্লাহ্। মনসুর বলল ঃ আমি অনুমতি দিলাম। আমি আপনার উপদেশে ধন্য ও কৃতজ্ঞ। আমি এটা কবুল করলাম। আল্লাহ্ তাআলা তওফীক দিন ও সাহায্য করুন। আমি তাঁর কাছেই সাহায্য চাই এবং তাঁর উপরই ভরসা করি। আমি আশা করি আপনি আমাকে এরূপ নেক দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করবেন না। আপনার উক্তি মকবুল এবং উপদেশদানের সাথে আপনার কোন মতলব জড়িত থাকে না। আমি বললাম ঃ তাই করব ইনশাআল্লাহ্।

মুহাম্মদ ইবনে মুসইব বলেন ঃ মনসুর তাঁর জন্যে পাথেয় দেয়ার নির্দেশ দিল, কিন্তু আওযায়ী তাতে সম্মত হলেন না এবং বললেন ঃ এর প্রয়োজন নেই। আমি আমার উপদেশকে পার্থিব ধন-সম্পদের বিনিময়ে বিক্রয় করতে চাই না। এর পর মনসুর আর পীড়াপীড়ি করেনি।

ইবনে মুহাজির বলেন ঃ খলীফা মনসুর মক্কায় হজ্জ করতে এসে সরকারী বাসভবন থেকে শেষ রাত্রে তওয়াফ করতে বের হত এবং তওয়াফ ও নামায আদায় করত। কেউ তা জানতে পারত না। সকাল হলে সে বাসভবনে ফিরে আসত। তখন মুয়াযযিন এসে তাকে সালাম করত এবং সে মুসল্লীদের নামায পড়াত। এক রাতে সেহরীর সময় সে হরম শরীফে তওয়াফ করছিল, এমন সময় এক ব্যক্তিকে মুলতাযামের কাছে এ কথা বলতে শুনল ঃ ইলাহী, আমি তোমার দরবারে অভিযোগ করছি! পৃথিবীতে নাফরমানী ও ফাসাদ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। যুলুম ও লালসা হক এবং হকদারদের মধ্যে অন্তরায় হয়ে গেছে। মনসুর একথা শুনে কানখাড়া করে লোকটির মোনাজাত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করল। এর পর মসজিদের কাছে বসে লোকটিকে ডাকল। দূত যেয়ে বলল ঃ চল, আমীরুল মুমেনীন তোমাকে ডাকছে। লোকটি দু'রাকআত নামায পড়ে হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করে দূতের সাথে রওয়ানা হল। মনসুরকে সালাম করতেই সে জিজ্ঞেস করল ঃ তুমি যে বলেছ- পৃথিবীতে নাফরমানী ও ফাসাদ হচ্ছে এবং যুলুম ও লালসা হক এবং হকদারদের মধ্যে অন্তরায় হয়ে গেছে- এর মানে কি? তোমার একথা শুনে আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি এবং অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছি। লোকটি বলল ঃ আমীরুল মুমেনীন! যদি আপনি আমাকে প্রাণের অভয় দেন, তবে আমি সব কথা

মূল শিকড়সহ আপনাকে বলে দেব। নতুবা আমি নিজের ধান্ধায়ই ব্যাপৃত থাকব। মনসুর বলল ঃ তোমাকে প্রাণের অভয় দিলাম। লোকটি বলল ঃ সত্য বলতে কি, যেব্যক্তির মধ্যে এতটুকু লালসা এসে গেছে যে, সে হক ও হকদারের মধ্যে অন্তরায় হয়ে গেছে এবং নাফরমানী ও ফাসাদ নিবারণে প্রতিবন্ধক হয়ে গেছে, সে ব্যক্তি স্বয়ং আপনি। মনসুর বলল ঃ হতভাগা, আমার মধ্যে এত লালসা কেন আসবে, অর্থসম্পদ, সোনাদানা এবং ক্ষমতা সবই তো আমার করতলগত। লোকটি বলল ঃ আমীরুল মুমেনীন, যে পরিমাণ লালসা আপনার মধ্যে প্রবেশ করেছে, সেই পরিমাণ অন্য কারও মধ্যে প্রবেশ করেছে কিনা সন্দেহ। দেখুন তো, আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে মুসলমানদের শাসক করেছিলেন, যাতে আপনি তাদের কাজ-কারবার ও ধন-সম্পদের হেফাযত করেন, কিন্তু আপনি তাদের কাজ-কারবার থেকে গাফেল হয়ে তাদের ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করার কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়েছেন। নিজের মধ্যে ও তাদের মধ্যে ইট, চুনার প্রাচীর, লৌহ-দরজা এবং সশস্ত্র দারোয়ান খাড়া করেছেন। আপনি নিজেকে প্রাসাদের মধ্যে আবদ্ধ করে নিয়েছেন, যাতে সাধারণ মুসলমান আপনার কাছে যেতে না পারে। সরকারী কর্মচারীদেরকে ধন-সম্পদ একত্রিত করা এবং খেরাজ আদায় করার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপন উজির ও সহকারী যালেমদেরকে নিযুক্ত করেছেন। আপনি ভুলে গেলে তারা স্মরণ করিয়ে দেয় না, আর আপনি ভাল কাজ করতে চাইলে তারা সহযোগিতা করে না। আপনি তাদেরকে অর্থ-সম্পদ, যানবাহন ও অস্ত্র দিয়ে যুলুমের কাজে শক্তিশালী করে দিয়েছেন। আপনি নির্দেশ দিয়েছেন, নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়া, যাদের নাম আপনি উজিরদেরকে বলে দিয়েছেন– অন্য কেউ যেন আপনার কাছে না আসে। কোন মজলুম, দুর্দশাগ্রস্ত ভুখা-নাঙ্গা মানুষ আপনার কাছ থেকে কিছু আর্থিক সুবিধা লাভ করুক, আপনি এর অনুমতি দেননি। অথচ তাদের প্রত্যেকেরই সরকারী ধন-সম্পদে হক আছে। আপনি যেসকল পারিষদকে খাস মোসাহেব নিযুক্ত করেছেন এবং সাধারণ প্রজাকুলের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন, তারা যখন দেখল, রাজকোষ থেকে কতক সম্পদ আপনি নিজ ভোগ-বিলাসের জন্যে নিয়ে যান এবং তা মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করেন না, তখন তারা মনে মনে বলল, খলীফা আল্লাহর হকে খেয়ানত করে, আমরা খেয়ানত করব না কেন? তাই তারা পরস্পরে ঐকমত্য করে নিল যে, যারা প্রজাদের গোপন তথ্যাবলী জানে, তারা যেন খলীফার কাছে পৌঁছাতে না পারে কিংবা যেসকল কর্মচারী সৎপথে থাকতে চায়, তারা

যেন আপন আপন পদে বহাল থাকতে না পারে। আপনার ও আপনার মোসাহেবদের এ সকল কীর্তিকলাপের কারণে সাধারণ মানুষ আপনার পারিষদবর্গকে ভয় করে। কর্মচারীরা তাদের কাছে উপঢৌকন প্রেরণ করে তাদের সাথে ভাব করে নিয়েছে, যাতে তারা নির্বিচারে প্রজাদের উপর যুলুম করে যেতে পারে। এর পর অন্যান্য প্রভাবশালী ধনী ব্যক্তিরা আপনার পারিষদবর্গকে ঘুষ দিয়ে তাদের নিম্নস্তরের লোকদের উপর ইচ্ছামত যুলুম করার পারমিট হাসিল করেছে। এমনিভাবে আল্লাহর শহরসমূহ অবাধ্যতা, যুলুম ও ফাসাদে পূর্ণ হয়ে গেছে। আপনার মোসাহেবরা আপনার অজ্ঞাতে ক্ষমতায় আপনার অংশীদার হয়ে গেছে। কোন বিচারপ্রার্থী বিচার লাভের আশায় আগমন করলে তারা তাকে আপনার কাছে যেতে দেয় না। আপনার সওয়ারী বের হওয়ার সময় তারা কোন আর্জি লেখে আপনার হাতে দিতে চাইলে তারা আপনার নিষেধাজ্ঞার কথা শুনতে পায়। আপনি এক ব্যক্তিকে মযলুমদের হক দেখাশুনা করার জন্যে নিযুক্ত করেছেন। মজলুমরা তার কাছে গেলে যদি মোসাহেবরা শুনতে পায়, তবে দেখাশুনাকারীকে বলে দেয় যে, তার আর্জি খলীফার কাছে পেশ করো না। ফলে দেখাশুনাকারী কর্মচারীটি মোসাহেবদের ভয়ে যা চায়, তা আপনার কাছে বলতে পারে না। মযলুম ব্যক্তি যখন চেষ্টা সত্ত্বেও যুলুমের প্রতিকার পায় না, তখন আপনার সওয়ারী বের হওয়ার সময় আপনার কাছে ফরিয়াদ পেশ করে। তখন তাকে এমন বেদম প্রহার করা হয় যে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যথাস্থানে থাকে না। আপনি তাকিয়ে থাকেন– না হাতে বাধা দেন, না মুখে নিষেধ করেন। এমতাবস্থায় সাধারণ মুসলমানের কি করার থাকে? এর আগে উমাইয়া বংশের রাজত্ব ছিল। মজলুম তাদের মধ্যে পৌঁছলে অনতিবিলম্বে তার মোকদ্দমা পেশ করা হত এবং ইনসাফ হয়ে যেত। মাঝে মাঝে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এসে শাহী দরজায় মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। চতুর্দিক থেকে তারা দৌড়ে এসে তাকে জিজ্ঞেস করত, তোমার কি চাই! এর পর তারা তার মোকদ্দমা শাহী দরবারে পেশ করে ইনসাফ করিয়ে দিত। আমীরুল মুমেনীন, আমি এক সময় চীন দেশে সফর করতাম। একবার আমি সেখানে গিয়ে দেখলাম, সেখানকার রাজা বধির হয়ে গেছে। শ্রবণশক্তি বিনষ্ট হওয়ায় সে অহরহ কান্নাকাটি করত। একদিন উযীররা তাকে এত কান্নাকাটি করার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ আমি বধির হয়ে গেছি। এতে আমার নিজের যে বিপদ হয়েছে, তার জন্যে আমি দুঃখ করি না। আমার দুঃখ এ জন্যে যে, মযলুমরা

আমার দরজায় দাঁড়িয়ে চীৎকার করবে, কিন্তু আমি তাদের আওয়াজ শুনতে পাব না। এর পর রাজা দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে বলল ঃ আমি শ্রবণশক্তি হারিয়েছি, তাতে কি হয়েছে? আমার চক্ষু তো বিদ্যমান আছে। আজ থেকে রাজ্যময় ঘোষণা করে দাও- কেউ লাল পোশাক পরিধান করতে পারবে না। একমাত্র যে মযলুম, সে-ই লাল পোশাক পরিধান করবে। আমি পোশাক দেখে ধরে নেব সে মযলুম। এর পর তার যুলুমের প্রতিকার করব। এর পর রাজা হাতীর পিঠে সওয়ার হয়ে সকাল-বিকাল ঘোরাফেরা করত, যাতে কোন মযলুম দৃষ্টিগোচর হলে তাকে ইনসাফ দেয়া যায়। আমীরুল মুমেনীন, চিন্তার বিষয়, চীনের রাজা মুশরিক হয়েও মুশরিক প্রজাকুলের প্রতি এতটুকু সদয় হতে পারলে আপনি তো আল্লাহ্ তাআলার প্রতি ঈমান রাখেন এবং আপনি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পিতৃব্যের সন্তান, মুসলমান প্রজাকুলের জন্যে আপনার কতটুকু মেহেরবান হওয়া দরকার! এসব উপদেশ শুনে মনসুর হো হো করে কাঁদতে লাগল। এর পর জিজ্ঞেস করল ঃ যে রাজত্ব আমি লাভ করেছি, তা কিভাবে পরিচালনা করব? সকল মানুষই তো বিশ্বাসঘাতক দৃষ্টিগোচর হয়। লোকটি বলল ঃ আমীরুল মুমেনীন, আপনি উঁচুস্তরের ইমাম ও মুরশিদ আলেমগণকে সঙ্গে রাখুন। খলীফা বলল ঃ তারা তো আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকে। লোকটি বলল ঃ তাদের সরে থাকার কারণ হচ্ছে, তারা আশংকা করে কোথাও আপনি তাদের দিয়ে সেই কাজ না করান, যে কাজ কর্মচারীদের দিয়ে করিয়ে থাকেন। বরং আপনি দরজা উন্মুক্ত করুন, দারোয়ান হ্রাস করুন, মযলুমের শোধ যালেমের কাছ থেকে নিন, যালেমকে যুলুম থেকে বিরত রাখুন, হালাল ও পবিত্র উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করুন এবং ন্যায় ও ইনসাফ সহকারে বন্টন করুন। এর পর আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, যারা এখন আপনার কাছ থেকে দূরে সরে থাকে, তারা আপনার কাছে আসবে এবং প্রজাসাধারণের কল্যাণ সাধনে আপনাকে সাহায্য করবে। মনসুর বলল ঃ ইলাহী, এই লোকের কথামত কাজ করার তওফীক আমাকে দান কর। এমন সময় হরম শরীফের মুয়াযযিন এসে মনসুরকে সালাম করল। নামায পড়ানোর পর মনসুর শাহী দরবারের রক্ষীকে আদেশ দিল ঃ সেই লোকটিকে আমার দরবারে হাযির কর। যদি হাযির করতে না পার, তবে তোমার গর্দান উড়িয়ে দেব। রক্ষী অমনি তার খোঁজে বের হল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখল, ঠিক সে ব্যক্তি একটি উপত্যকায় নামায পড়ছে। রক্ষী অপেক্ষা করতে লাগল। নামায শেষে সে লোকটিকে বলল ঃ মিয়া সাব, আপনি আল্লাহকে ভয় করেন? লোকটি

বলল ঃ হাঁ। রক্ষী বলল ঃ তাহলে আপনি আমার সাথে খলীফার কাছে চলুন। খলীফা কসম খেয়েছেন- আমি আপনাকে সাথে না নিয়ে গেলে তিনি আমাকে মেরে ফেলবেন। লোকটি বলল ঃ এখন তো যাওয়ার কোন উপায় নেই। রক্ষী বলল ঃ তাহলে মনসুর আমাকে নির্ঘাত মেরে ফেলবেন। লোকটি বলল ঃ না, মারবে না। অতঃপর সে একটি লিখিত বস্তু বের করে রক্ষীর হাতে দিয়ে বলল ঃ এটি নাও এবং তোমার পকেটে রেখে দাও। এতে প্রশস্ততার দোয়া লিখিত আছে! রক্ষী বলল ঃ প্রশস্ততার দোয়া কি? সে বলল ঃ এই দোয়া শহীদগণ ছাড়া আল্লাহ্ তাআলা অন্য কাউকে দান করেন না। রক্ষী বর্ণনা করে, আমি লোকটিকে বললাম ঃ আপনি যখন আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তখন আর একটি অনুগ্রহ করুন, দোয়াটি আমাকে বলে দিন এবং এর গুণাগুণ সম্পর্কেও জ্ঞাত করুন। লোকটি বলল ঃ যেব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় এই দোয়া পাঠ করবে, তার গোনাহ বিলুপ্ত হবে, দুশমনের বিরুদ্ধে স্থায়ী সাহায্য পাবে, আল্লাহ্ তাআলার কাছে "সিদ্দীক" লিখিত হবে এবং শহীদ হওয়া ছাড়া অন্য কোনভাবে মারা যাবে না। দোয়াটি এই ঃ

اللهم كما لطفت في عظمتك دون اللطفاء وعلوت بعظمتك على العظماء وعلمت ما تحت ارضك كعلمك بما فوق عرشك وكانت وساوس الصدور كالعلانية عندك وعلانية القول كالسر في علمك وانقاد كل شئ بعظمتك وخضع كل ذي سلطان سلطانك وصار امر الدنيا والاخرة كلمة بيدك اجعل لي من كل هم امسيت فيه فرجا ومخرجا اللهم ان عفوك عن ذنوبي وتجاوزك عن خطيئتي وسترك على قبيح عملي اطمعني ان اسئلك مالا استوجبه لما قصرت فيه ادعوك امنا واسئلك مستانسا انك المحسن لي وانا المسئ الى نفسي فيما بيني وبينك تتود الي بالنعم وابتغض اليك بالمعاصي ولكن الثقة بك حملتني على الجراة عليك فعد بفضلك واحسانك على انك انت التواب الرحيم.

'ইলাহী! আপনি আপন মাহাত্ম্যে সকল পবিত্রের চেয়ে পবিত্র এবং

আপন মহত্ত্ব দ্বারা সকল মহানের উপর মহান। আপনি আপনার পৃথিবীর পাতালের বস্তু জানেন যেমন জানেন আপনার আরশের উপরকার বস্তু। অন্তরের গোপন কথা আপনার কাছে প্রকাশ্য উক্তির ন্যায় এবং প্রকাশ্য ও গোপন কথা আপনার জানায় একই রূপ। আপনার মাহাত্ম্যের সামনে প্রত্যেক বস্তু অবনমিত এবং প্রত্যেক প্রতাপশালী আপনার প্রতাপের সামনে হীন। দুনিয়া ও আখেরাতের ব্যাপারাদি সম্পূর্ণ আপনার করায়ত্ত। আমার জন্যে প্রশস্ততা ও নিষ্কৃতির পথ করে দিন প্রত্যেক শংকা থেকে, যাতে আমি লিপ্ত আছি। ইলাহী, আপনি আমার গোনাহ্ মাফ করেছেন, আমার ত্রুটি মার্জনা করেছেন এবং আমার মন্দ কাজ ঢেকে রেখেছেন– এগুলো আমাকে আশা দিয়েছে যে, আমি আপনার কাছে সে বিষয় প্রার্থনা করি, যার যোগ্য আমি নই গোনাহের কারণে। আমি আপনার কাছে অবাধে দোয়া করি। নিশ্চয় আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহকারী। আর আমি আমার নিজের প্রতি অন্যায়কারী। অতএব আমার মধ্যে ও আপনার মধ্যে কি সম্পর্ক? আপনি নেয়ামত দিয়ে আমার বন্ধু হন, আর আমি গোনাহ্ করে আপনার শত্রু হই, কিন্তু আপনার উপর আমার ভরসা আমাকে সাহস প্রদর্শনে অনুপ্রাণিত করেছে। অতএব আপনি আমার প্রতি পূর্ববৎ কৃপা ও অনুগ্রহ করুন। নিশ্চয় আপনি তওবা কবুলকারী, দয়ালু।'

রক্ষী বলে, আমি এই কাগজ পকেটে রেখে দিলাম। এর পর অন্য কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা আমীরুল মুমেনীনের কাছে চলে এলাম। আমি সালাম করতেই তিনি মাথা তুলে আমার দিকে দেখলেন, অতঃপর মুচকি হেসে বললেন ঃ তুমি বোধ হয় খুব যাদু জান। আমি বললাম ঃ আমীরুল মুমেনীন, যাদু কি, আমি জানি না। অতঃপর ঘটনা বর্ণনা কললাম ঃ খলীফা বললেন ঃ বুযুর্গ ব্যক্তি তোমাকে যে কাগজখণ্ড দিয়েছেন, তা আন। আমি কাগজটি তার হাতে দিলে তিনি তা দেখে ক্রন্দন করতে লাগলেন, অতঃপর বললেন ঃ তুমি বেঁচে গেলে। এর পর তিনি আমাকে দশ হাজার দেরহাম দেয়ার আদেশ দিয়ে বললেন ঃ তুমি জান এই বুযুর্গ কে? আমি বললাম ঃ না। তিনি বললেন ঃ ইনি হযরত খিযির (আঃ)।

আবু এমরান জওফী বলেন ঃ হারুনুর রশীদ যখন খেলাফতের গদিতে বসলেন, তখন আলেমগণ তার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন এবং তাকে মোবারকবাদ দেন। খলীফাও রাজকোষ উজাড় করে উপঢৌকন ও পুরস্কার দিতে শুরু করেন। হারুনুর রশীদ খেলাফত লাভের পূর্বে আলেম ও দরবেশগণের সাথে উঠাবসা করতেন এবং বাহ্যত সংসারের প্রতি

অনাসক্তি ও ভগ্নদশার অধিকারী ছিলেন। হযরত সুফিয়ান সওরীর সাথে তার দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব ছিল। খলীফা হওয়ার পর হযরত সুফিয়ান তার সাথে সাক্ষাৎ বর্জন করেন। তিনি তাকে মোবারকবাদ দিতে আসেননি। হারুনুর রশীদ তাঁর সাথে একান্তে কিছু কথাবার্তা বলতে আগ্রহী হলেন, কিন্তু হযরত সুফিয়ান এলেন না। তিনি হারুনুর রশীদের বর্তমান পদমর্যাদারও পরওয়া করলেন না। বিষয়টি খলীফার জন্য পীড়াদায়ক ছিল। তাই তিনি হযরত সুফিয়ান সওরীর খেদমতে এই মর্মে একটি পত্র লেখলেন ঃ

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আল্লাহর বান্দা হারুনুর রশীদ আমীরুল মুমেনীনের পক্ষ থেকে তার ভাই সুফিয়ান সওরীর নামে-

হামদ, নাত ও সালাম পর সমাচার, আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেছেন এবং একে নিজের জন্যে ও নিজের সম্পর্কে সাব্যস্ত করেছেন। আমি আপনার সাথে যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছি, তার সম্পর্ক ছিন্ন করিনি এবং আপনার বন্ধুত্ব ভঙ্গ করিনি; বরং এখন পর্যন্ত আপনার কাছ থেকে উত্তম মহব্বত ও পূর্ণ বিশ্বাস অর্জিত আছে। যদি আল্লাহ্ তাআলা খেলাফতের গুরুভার আমার স্কন্ধে অর্পণ না করতেন, তবে আমি হামাগুড়ি দিয়ে আপনার খেদমতে উপস্থিত হতাম। কেননা, আমার অন্তর আপনার মহব্বতে পরিপূর্ণ। আমার ও আপনার বন্ধুদের মধ্যে এমন কেউ বাকী নেই, যে আমাকে মোবারকবাদ দিতে আসেনি। আমিও রাজকোষ উন্মুক্ত করে এত পুরস্কার বিতরণ করেছি যে, আমার চক্ষু শীতল ও অন্তর প্রফুল্ল হয়ে গেছে, কিন্তু আপনি তশরীফ আনতে বিলম্ব করছেন এবং এখন পর্যন্ত শুভাগমন করেননি। তাই আমি এ পত্রখানা পরম আগ্রহ সহকারে আপনার খেদমতে প্রেরণ করলাম। হে আবু আবদুল্লাহ্, আপনি জানেন, ঈমানদারের সাথে সাক্ষাতের কি পরিমাণ সওয়াব বর্ণিত আছে। যখন এই আগ্রহভরা পত্রটি আপনার হাতে পৌঁছবে, তখন কালবিলম্ব না করে আপনি এখানে পদার্পণ করুন।

চিঠি লেখা সমাপ্ত করে হারুনুর রশীদ উপস্থিত সভাসদদের দিকে তাকালেন। উদ্দেশ্য, এ পত্রটি কে সুফিয়ান সওরীর কাছে নিয়ে যাবে? কিন্তু সকলেই হযরত সুফিয়ান সওরীর গরম মেযাজ সম্পর্কে অবগত ছিল। তাই কেউ সাহস করল না। খলীফা বললেন ঃ দারোয়ানদের মধ্য থেকে একজনকে ডাক। সেমতে ওব্বাদ তালেকানী নামীয় এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হল। খলীফা বললেন ঃ ওব্বাদ, আমার পত্রটি নিয়ে কুফায়

যাও। বস্তিতে প্রবেশ করে বনী সওর গোত্রের কথা জিজ্ঞেস করবে। এর পর সুফিয়ান সওরী সম্পর্কে জেনে নেবে। তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হলে আমার এ পত্রটি তাঁর হাতে দেবে। খবরদার, তাঁর যা অবস্থা দেখবে, শুনবে, তা মনে প্রাণে স্মরণ রাখবে– বিন্দুমাত্রও বিস্মৃত হবে না। এর পর হুবহু তা আমার কাছে এসে বর্ণনা করবে। ওব্বাদ পত্র নিয়ে গন্তব্যস্থলে রওয়ানা হয়ে গেল। কুফায় পৌঁছে বনী সওরের কথা জিজ্ঞেস করলে লোকেরা বলে দিল। এর পর সুফিয়ান সওরীর হাল জিজ্ঞেস করলে কেউ বলল ঃ তিনি মসজিদে তশরীফ রাখেন। ওব্বাদ বর্ণনা করেন ঃ আমি মসজিদের পথ ধরলাম। আমি তাঁকে দেখতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন ঃ আমি আশ্রয় চাই আল্লাহ্ তাআলার কাছে জানাশুনা বিতাড়িত শয়তান থেকে। ইলাহী, আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই সেই আগন্তুক থেকে, যে আমার কাছে কল্যাণ ছাড়া অন্য কোনভাবে আসে। তাঁর এসব কথার প্রভাবে আমি সংকীর্ণ হয়ে গেলাম। তিনি যখন আমাকে মসজিদের গেইটে সওয়ারী থেকে নামতে দেখলেন, তখন নামায পড়তে লাগলেন। অথচ তখন কোন নামাযের সময় ছিল না। আমি ঘোড়া বাইরে বেঁধে রেখে ভিতরে প্রবেশ করলাম। তাঁর সহচররা মাথা নত করে বসে ছিল– তাঁরা যেন চোর; বাদশাহের শাস্তির ভয়ে তটস্থ। আমি সালাম করলে কেউ মাথা তুলে আমাকে দেখল না, অঙ্গুলির ইশারায় সালামের জওয়াব দিল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। কেউ আমাকে বসতে বলল না। তাদের ভয়ে আমার সর্বাঙ্গে কম্পন দেখা দিল। আমি চিন্তা করলাম, ইনিই হবেন সুফিয়ান সওরী, যিনি নামায পড়ছেন। আমি পত্রটি তাঁর সম্মুখে নিক্ষেপ করলাম। তিনি পত্র দেখে কেঁপে উঠলেন এবং এমনভাবে আত্মরক্ষা করলেন, যেন সেজদার জায়গায় সর্প আবির্ভূত হয়েছে। অতঃপর তিনি নামায শেষ করে চোগার আস্তিনে হাত জড়িয়ে পত্রটি ধরলেন এবং পেছন দিকে সহচরদের কাছে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর বললেন ঃ তোমাদের কেউ এটি পড়ে নাও। আমি এমন বস্তুতে হাত লাগাতে আল্লাহ্ তাআলার কাছে ক্ষমা চাই, যা যালেম স্পর্শ করেছে। এক ব্যক্তি ভয়ে ভয়ে পত্রটি খুলল, যেন তাতে সর্প রয়েছে, যা দংশন করতে উদ্যত। সে পত্রটি আদ্যোপান্ত পাঠ করল। পত্র পাঠ সমাপ্ত হলে হযরত সুফিয়ান বললেন ঃ যালেমের পত্রের অপর পৃষ্ঠায় জওয়াব লেখে দাও। সহচররা বলল ঃ হে আবু আবদুল্লাহ্, পত্র লেখক একজন খলীফা। তাই একটি পরিচ্ছন্ন ও উৎকৃষ্ট কাগজে জওয়াব লেখা সমীচীন। তিনি বললেন ঃ না, তার পত্রের অপর পিঠেই জওয়াব লেখ। সে এ কাগজটি হালাল উপায়ে অর্জন করে থাকলে এর সওয়াব পাবে, অন্যথায় শাস্তি ভোগ করবে। যালেম যে

কাগজ স্পর্শ করেছে, তা আমাদের কাছে থাকা উচিত নয়। থাকলে আমাদের ধর্ম বিনষ্ট করবে। সহচররা জিজ্ঞেস করল ঃ কি জওয়াব লেখব? তিনি বললেন ঃ লেখ,

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বান্দা মুনীব সুফিয়ান ইবনে সায়ীদ সওরীর পক্ষ থেকে সেই বান্দার প্রতি, যে আশার ছলনায় বিভ্রান্ত এবং ঈমানের স্বাদ থেকে বঞ্চিত; অর্থাৎ, হারুনুর রশীদের প্রতি–

সালাম, হামদ ও নাতের পর সমাচার, আমি এ পত্র তোমাকে এ কথা জানানোর জন্যেই লেখছি যে, আমি তোমার মহব্বতের সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছি। এখন আমি তোমার দুশমন হয়ে গেছি। কেননা, তুমি নিজে স্বীকার করেছ, তুমি রাজকোষ উন্মুক্ত করে আমার মহব্বতে ব্যয় করে ফেলেছ। তুমি আমাকে এ বিষয়ে সাক্ষী করেছ যে, তুমি মুসলমানদের ধন-সম্পদ অযথা ব্যয় করেছ। তুমি আপন কাজ করেই সন্তুষ্ট থাকনি; বরং আমি দূরে থাকা সত্ত্বেও আমার কাছে পত্র লেখেছ, যাতে তোমার বিরুদ্ধে আমি এবং আমার সহচররা, যারা এ পত্র পাঠ করেছে– সাক্ষী হয়ে যায়। স্মরণ রেখ, আমরা কাল কেয়ামতে আল্লাহ্ তাআলার সম্মুখে তোমার অন্যায় কর্মকাণ্ডের সাক্ষ্য দেব। হে হারুন, তুমি মুসলমানদের রাজকোষ অযথা উজাড় করে দিয়েছ। অথচ এতে কোরআন মজীদের নির্দেশ অনুযায়ী সাত দল মানুষের হক ছিল। তোমার এ কাজে কোন্ দলটি সন্তুষ্ট হয়েছে? যাদের মন ঈমানের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যে দান করা হয়, তারা সন্তুষ্ট হয়েছে, না যাকাতের কর্মচারীরা, না আল্লাহর পথে জেহাদকারীরা, না মুসাফিররা, না কোরআন বাহক আলেম অথবা বিধবা মহিলা অথবা অনাথ শিশুরা সন্তুষ্ট হয়েছে? সুতরাং এখন জিজ্ঞাসাবাদের জওয়াব দেয়ার জন্যে তৎপর হও এবং নিজের বিপদ দূর করার চিন্তা কর। জেনে রেখ, তুমি অচিরেই ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্তার সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে এবং তোমাকে তোমার নিজের সম্পর্কে পাকড়াও করা হবে। কেননা, তুমি এলেম, সংসারের প্রতি অনাসক্তি, কোরআন মজীদ ও পুণ্যবানদের কাছে বসার স্বাদ বিনষ্ট করে দিয়েছ এবং নিজের জন্যে যুলুম ও যালেমদের নেতা হওয়া পছন্দ করে নিয়েছ। হে হারুন, তুমি সিংহাসনে উপবেশন করেছ, রেশমী বস্ত্র পরিধান করেছ এবং দরজায় পর্দা ঝুলিয়েছ। এসব পর্দা দ্বারা তুমি বিশ্ব পালকের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি করেছ। এর পর তোমার যালেম সিপাহীদেরকে দরজা ও পর্দার কাছে বসিয়ে দিয়েছ। তারা মানুষের উপর যুলুম করে– ইনসাফ করে না।

নিজেরা মদ্যপান করে এবং অন্য কেউ পান করলে তাকে বেদম প্রহার করে। নিজেরা যিনা করে এবং অন্য যিনাকারদের উপর "হদ" (যিনার শাস্তি) জারি করে। এমনিভাবে নিজেরা চুরি করে এবং অন্য চোরদের হস্ত কর্তন করে। শরীয়তের বিধি-বিধান যেন তোমার সাঙ্গপাঙ্গদের জন্যে প্রযোজ্য নয়। হে হারুন, কাল কি হবে যখন একজন ঘোষক আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ঘোষণা করবে اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَزْوَاجَهُمْ একত্রিত কর যালেমদেরকে এবং তাদের সাঙ্গপাঙ্গদেরকে। তোমাকে ঘাড়ের সাথে হাত বাঁধা অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সামনে পেশ করা হবে। তোমার ন্যায়পরায়ণতা ছাড়া অন্য কোন কিছু এই বন্ধন খুলতে না। অন্য যালেমরা তোমার চারপাশে থাকবে। তুমি সরদার ও নেতা হয়ে সকলকে দোযখে নিয়ে যাবে। হে হারুন, আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, তোমাকে কেয়ামতে ঘাড়ে ধরে পেশ করার জায়গায় হাযির করা হয়েছে, আর তুমি তোমার পুণ্যসমূহ অপরের পাল্লায় দেখতে পাচ্ছ এবং নিজের গোনাহ্ ছাড়া অন্যদের গোনাহ্ও তোমার পাল্লায় দেখে যাচ্ছ। বিপদের পর বিপদ, অন্ধকারের উপর অন্ধকার। অতএব হে হারুন, আমার ওসিয়ত মনে রাখ। তোমাকে যে উপদেশ দিয়েছি তা পালন করে যাও। মনে রেখ, আমি তোমার শুভেচ্ছায় ও হিতোপদেশে কোন ত্রুটি বাকী রাখিনি। অতএব তুমি তোমার প্রজাকুলের ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলাকে ভয় কর। উম্মতে মুহাম্মদীর ব্যাপারে রসূলে করীম (সাঃ)-এর সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখ। তাদের উপর খেলাফত উত্তমরূপে পরিচালনা কর। জেনে রাখ, যদি খেলাফত খলীফাদের কাছে স্থায়ী হত তবে তোমার কাছে পৌঁছত না। খেলাফত তোমার কাছ থেকেও চলে যাবে। এমনিভাবে দুনিয়া সকল মানুষকে একজন একজন করে নিয়ে যায়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন ভাণ্ডার সংগ্রহ করে নেয়, যা তার জন্যে উপকারী এবং কেউ কেউ দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমার ধারণা, তুমিও তাদেরই একজন, যারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত। খবরদার, এরপরে আমার কাছে কোন পত্র লেখবে না। আমিও কোন জওয়াব লেখব না। ওয়াস্সালাম।

ওব্বাদ বর্ণনা করে, এ পত্রটি লেখিয়ে ভাঁজ করা ও মোহর লাগানো ছাড়াই আমার দিকে নিক্ষেপ করে দিলেন। আমি পত্রটি নিয়ে কুফার বাজারে এলাম। হযরত সুফিয়ান সওরীর উপদেশ আমার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল। আমি বাজারে পৌঁছে উচ্চ স্বরে ডাক দিলাম ঃ হে কুফাবাসীগণ! উপস্থিত লোকেরা আমাকে বলল ঃ বলুন, কি বলতে চান।

আমি বললাম ঃ এক ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার কাছ থেকে পলাতক ছিল। এখন আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। আপনারা কেউ তাকে ক্রয় করবেন কি? লোকেরা আমার কাছে আশরফী এনে হাযির করল। আমি বললাম ঃ আমার আশরফীর প্রয়োজন নেই; বরং আমি একটি মোটা সূতী কোর্তা ও একটি পশমী কম্বল চাই। লোকেরা আমাকে তাই এনে দিল। আমি সেগুলো পরিধান করে নিলাম এবং খলীফার সামনে যে পোশাক পরতাম, তা খুলে ফেললাম। আমার সঙ্গে যে অস্ত্র ছিল, তা ঘোড়ার পিঠে রেখে ঘোড়ার লাগাম ধরে পায়ে হেঁটে রওয়ানা হলাম। অবশেষে যখন খলীফা হারুনুর রশীদের দরজায় পৌঁছলাম, তখন লোকেরা আমাকে খালি পায়ে, পদব্রজে, অদ্ভুত পোশাক পরিহিত দেখে খুব ঠাট্টা-পরিহাস করল। অতঃপর আমি যখন খলীফার সম্মুখে গেলাম এবং তিনি আমাকে এ অবস্থায় দেখলেন, তখন কয়েকবার উঠাবসা করলেন, এর পর দাঁড়িয়ে অনুতাপ প্রকাশ করে বললেন ঃ আফসোস, দূত উপকৃত হয়েছে এবং প্রেরক বঞ্চিত হয়েছে। সংসার দিয়ে কি হবে? রাজত্ব আমার কি উপকারে আসবে? অপসৃয়মাণ ছায়ার মত দ্রুত বিলীন হয়ে যাবে। অতঃপর হযরত সুফিয়ান সওরী আমাকে যেমন খোলা চিঠি দিয়েছিলেন, আমি তেমনি তা খলীফার হাতে দিয়ে দিলাম। তিনি পাঠ করছিলেন আর ক্রন্দন করছিলেন। তার কান্নার আওয়াজ ক্রমশ উঁচু হচ্ছিল। খলীফার জনৈক সভাসদ বলল ঃ আমীরুল মুমেনীন, সুফিয়ান সওরীর ধৃষ্টতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আপনি যদি তার হাতে-পায়ে লোহার বেড়ী পরিয়ে দরবারে হাযির করান, তবে অন্যরা শিক্ষা পেয়ে যাবে। হারুনুর রশীদ বললেন ঃ হে দুনিয়ার বান্দারা, আমাকে এ কাজ থেকে মাফ কর। যে তোমাদের বিভ্রান্তিতে পড়ে, সে অত্যন্ত হতভাগা। তোমরা জান না সুফিয়ান সওরী অনন্য প্রতিভাধর ব্যক্তি। তাঁকে বাধা দিয়ো না। এর পর সুফিয়ান সওরীর পত্রটি সব সময় খলীফা হারুনুর রশীদের পার্শ্বে থাকত। তিনি আমৃত্যু প্রত্যেক নামাযের পর পত্রটি পাঠ করতেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন।

আবদুল্লাহ ইবনে মহরান বলেন ঃ হারুনুর রশীদ হজ্জ করার পর কুফায় এসে অবস্থান করেন। এর পর তার প্রস্থানের ডংকা বাজানো হয়। লোকজন এসে জড়ো হতে থাকলে বাহলুল পাগলও সেখানে এসে বসে গেল। এমন সময় খলীফা উটের পিঠে চাঁদোয়াযুক্ত হাওদায় বসে বের হলেন। বাহলুল উচ্চস্বরে ডেকে বলল ঃ ইয়া আমীরুল মুমেনীন! খলীফা মুখের উপর থেকে পর্দা সরিয়ে বললেন ঃ লাব্বায়াকা ইয়া বাহলুল।

আতঃপর বাহলুল বলল ঃ আমি হাদীস শুনেছি আয়মন ইবনে তাবেল থেকে, তিনি কেদামত ইবনে আবদুল্লাহ আমেরী থেকে, তিনি বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে হজ্জে আরাফাত থেকে ফিরতে দেখেছি । তিনি উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার ছিলেন। এ সময় না ছিল মারপিট, না ছিল ধাক্কাধাক্কি এবং না ছিল বাঁচো বাঁচো রব। আমীরুল মুমিনীন, এ সফরে আপনার জন্যে বিনয় প্রদর্শন করা উত্তম, অহংকার ও যুলুম করার তুলনায়। হারুন একথা শুনে ক্রন্দন করলেন, অতঃপর বললেন ঃ হে বাহলুল, আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। আরও কিছু বল। বাহলুল বলল ঃ উত্তম হে আমীরুল মুমেনীন, আল্লাহ তাআলা যাকে ধন-সম্পদ ও দৈহিক শ্রী দান করেন, অতঃপর সে ধনসম্পদ খয়রাত করে, দৈহিক সৌন্দর্যে সংযমী থাকে, তাকে আল্লাহর বিশেষ তালিকায় পুণ্যবানদের সাথে লেখে নেয়া হয়। খলীফা বললেন ঃ বাহলুল, তুমি চমৎকার বলেছ! অতঃপর তাকে কিছু পুরস্কার দিলেন। বাহলুল বলল ঃ এটা যার কাছ থেকে নিয়েছেন তাকে ফেরত দিন। আমার এর প্রয়োজন নেই। খলীফা বললেন ঃ তোমার কোন ঋণ থাকলে তা আমি শোধ করে দেই? বাহলুল বলল ঃ কুফার সকল আলেম এ বিষয়ে একমত যে, ঋণ পরিশোধের জন্য ঋণ করা ঠিক নয়। খলীফা বললেন ঃ আমি তোমার জন্যে কিছু ভাতা নির্ধারণ করে দেই, যাতে তোমার অন্নচিন্তা না থাকে। বাহলুল আকাশের দিকে মাথা তুলে বলল ঃ আমীরুল মুমেনীন, আমি এবং আপনি উভয়ই আল্লাহ তাআলার পরিবার। এটা অসম্ভব যে, তিনি আপনাকে স্মরণে রাখবেন আর আমাকে ভুলে যাবেন। এর পর খলীফা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে গেলেন।

আহমদ ইবনে ইবরাহীম মুকরী বলেন ঃ প্রসিদ্ধ বুযুর্গ আবুল হাসান সওরী (রঃ)-এর অভ্যাস ছিল, তিনি কোন অস্বীকার্য বিষয় থাকলে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও তা বিনষ্ট করে দিতেন। একদিন তিনি 'মাশারায়ে মাখামীন' নামক নদীতে অযু করছিলেন, এমন সময় একটি নৌকা দেখতে পেলেন, যার মধ্যে ত্রিশটি মট্‌কা রয়েছে। প্রত্যেকটি মটকার গায়ে 'লুত্‌ফ' শব্দটি লেখা ছিল। তিনি এর অর্থ বুঝতে পারলেন না। কেননা পণ্য ও পারিবারিক ব্যবহারের কোন বস্তুর নাম লুত্‌ফ ছিল বলে তাঁর জানা ছিল না। তিনি মাঝিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এসব মটকার মধ্যে কি আছে? মাঝি বলল ঃ আপনার এতে প্রয়োজন কি? আপনি নিজের কাজ নিজে করে যান। একথা শুনে হযরত সওরীর কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। তিনি বললেন ঃ আমি চাই এগুলোতে কি আছে তা আমাকে বলে দাও।

মাঝি বলল ঃ আপনি তো সুফী মানুষ, একথা শুনে আপনার লাভ কি? এগুলো খলীফা মুতাযিদ বিল্লাহর শরাব। তিনি বললেন ঃ শরাব! মাঝি বলল ঃ হাঁ। তিনি বললেন ঃ ঐ যে মুদগরটি দেখা যাচ্ছে, এটি আমার হাতে দাও। এতে মাঝি রাগ করে তার গোলামকে বলল ঃ দাও দেখি মুদগরটি তার হাতে। দেখা যাক কি করে। মুদগর হাতে পেয়েই তিনি নৌকায় সওয়ার হয়ে একটি একটি করে মট্‌কা ভেঙ্গে চুরমার করতে লাগলেন। অবশেষে একটি মট্‌কা রেখে তিনি সবগুলো ভেঙ্গে দিলেন। মাঝির ফরিয়াদে তিনি বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত করলেন না। অবশেষে স্থানীয় প্রশাসক ইউনুস ইবনে আফলাহ্ তাড়াতাড়ি এসে সওরীকে গ্রেফতার করে খলীফা মুতাযিদের দরবারে পাঠিয়ে দিল। খলীফা মুতাযিদের তরবারি প্রথমে চলত, মুখ পরে ফুটত। তাই সকলেরই বিশ্বাস ছিল, খলীফা তাকে হত্যা না করে ছাড়বে না। আবুল হাসান সওরী বলেন ঃ আমাকে যখন খলীফার সামনে নেয়া হয়, তখন সে চেয়ারে উপবিষ্ট ছিল এবং তার হাতে ছিল একটি বেত্রদন্ড। আমাকে দেখেই সে বলল ঃ তুমি কে? আমি বললাম ঃ আমি একজন সৎ এবং অসৎ কাজে আদেশ ও নিষেধকারী। সে বলল ঃ তোমাকে এ পদ কে দান করল? আমি বললাম ঃ যে আপনাকে খেলাফতের পদ দান করেছে। খলীফা কিছুক্ষণ মাথা নত করে রাখল, এর পর মাথা তুলে বলল ঃ তুমি এ কান্ড করলে কেন? আমি বললাম ঃ আমি আপনার অবস্থার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ভাবলাম, আপনার যে অনিষ্ট আমি দূর করতে পারি, তা দূর করতে ক্রুটি করব কেন? এর পর খলীফা মাথা নত করে আমার বক্তব্য অনুধাবন করতে লাগল। এর পর মাথা উঁচু করে বলল ঃ সকল মটকার মধ্য থেকে একটি মটকা কিরূপে বেঁচে গেল? আমি বললাম ঃ আমীরুল মুমেনীন অনুমতি দিলে আমি এর কারণ বর্ণনা করব! খলীফা বলল ঃ বর্ণনা কর। আমি বললাম ঃ আমীরুল মুমেনীন! আমি যখন মটকার দিকে ধাবিত হই, তখন আমার অন্তর আল্লাহ তাআলার প্রতাপে পরিপূর্ণ ছিল এবং আল্লাহর দাবীর ভয়ে মন আচ্ছন্ন ছিল। তাই আমি এগুলো ভেঙ্গে দেয়ার দুঃসাহস করতে পেরেছি। মানুষের ভয়ভীতি আমার মধ্যে বিন্দুমাত্রও ছিল না। সবগুলো মটকা ভাঙ্গার সময় আমার মধ্যে এ অবস্থাটি ছিল, কিন্তু শেষ মটকাটির কাছে পৌঁছার সময় আমার মধ্যে খলীফার মটকাসমূহ ভেঙ্গে দেয়ার একটি অহংকার আস্ফালন মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। তখনই আমি আমার হাত গুটিয়ে নিলাম। যদি এ সময়ও আমার মধ্যে পূর্ববৎ উদ্দীপনা অব্যাহত থাকত, তবে এ মটকা কেন, সমগ্র পৃথিবী মটকায় পরিপূর্ণ থাকলেও আমি একের

পর এক ভেঙ্গে চলে যেতাম– কোন কিছুরই পরওয়া করতাম না। খলীফা বলল ঃ যাও, আমি তোমাকে অবাধ ক্ষমতা দিলাম, যে কোন অস্বীকার্য বিষয় ইচ্ছা কর বিনষ্ট করে দাও। আমি বললাম ঃ আমীরুল মুমেনীন! এখন আপনার আদেশ শুনে বিনষ্ট করা আমি ভাল মনে করি না। কেননা, পূর্বে আমি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিনষ্ট করতাম। এখন আপনার আদেশের অধীনে বিনষ্ট করা হবে। খলীফা বলল ঃ তোমার মতলব কি? আমীরুল মুমেনীন! আমি চাই আপনি আমাকে সহীহ-সালামতে এখান থেকে চলে যাওয়ার আদেশ করুন। সেমতে খলীফা তাই করল। এর পর শায়খ আবুল হাসান সওরী বসরায় চলে এলেন। আবার কোন কারণে খলীফার সামনে যেতে হয়– এই ভয়ে তিনি অধিকাংশ সময় বসরাতেই অতিবাহিত করেন। মুতাযিদের মৃত্যুর পর তিনি পুনরায় বাগদাদে ফিরে যান।

সারকথা, আলেমগণ সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের ক্ষেত্রে শাসকবর্গের ঐশ্বর্য ও জাঁকজমকের পরওয়া কমই করতেন। বরং তারা আল্লাহ তাআলার কৃপার উপর ভরসা করতেন। যদি আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শাহাদত দান করতেন, তবে তারা তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন। যেহেতু তারা খাঁটি ও অকৃত্রিম নিয়তে এ কর্তব্য সম্পাদন করতেন, তাই তাদের বাণীর প্রভাবে কঠোরতর অন্তরও মোমের মত গলে নরম হয়ে যেত। এখন তো লোভ-লালসা আলেমদের মুখে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। এখন তারা কিছুই বলে না। যদি বা বলে, তাতে কোন উপকার হয় না। কেননা, মুখের কথা তাঁদের অবস্থার সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন হয় না। তারা সাচ্চা হলে অবশ্যই সফলকাম হত! কেননা, প্রজাকুল খারাপ হওয়ার মূলে রয়েছে শাসকবর্গ খারাপ হওয়া। আর শাসকবর্গের দোষক্রুটির মূলে রয়েছে আলেমদের দোষক্রুটি। অর্থ ও খ্যাতির মহব্বত আলেমদেরকে পথভ্রান্ত করে দিয়েছে। যেব্যক্তির মধ্যে দুনিয়ার মহব্বত প্রবল হবে, সে নীচ হীন লোকদেরকেও আদেশ-নিষেধ করতে সক্ষম হবে না– শাসক ও বড়লোকদেরকে তো দূরের কথা। আল্লাহ তাআলা সর্বাবস্থায় সাহায্যকারী।

দশম অধ্যায়

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর নিমিত্ত, যাঁর মহিমা অনুধাবনে হৃদয় ও মন হতবুদ্ধি এবং নূরের কিঞ্চিৎ দ্যুতির কারণে চক্ষু ও দৃষ্টি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তিনি গোপন রহস্যাবলী এবং অন্তরে লুক্কায়িত ভেদ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। তাঁর রাজত্ব পরিচালনায় উপদেষ্টা ও মন্ত্রীর প্রয়োজন নেই। দোষ গোপন করা এবং হৃদয় পরিবর্তন করা তাঁর কাজ এবং 'গাফফারুয্ যুনুব' (গোনাহ মার্জনাকারী) ও 'সাত্তারুল উয়ুব' (দোষ গোপনকারী) তাঁর নাম। দুরূদ ও সালাম হযরত শাফীউল মুয্নিবীন সাইয়েদুল মুরসালীন মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-এর প্রতি, যিনি ধর্মের শৃঙ্খলা বিধান করেছেন এবং ধর্মদ্রোহীদেরকে সমূলে উৎপাটিত করেছেন। তাঁর পবিত্র বংশধর ও পুণ্যাত্মা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অসংখ্য সালাম।

প্রকাশ থাকে যে, যে মর্যাদা ও উৎকর্ষের কারণে মানুষ "আশরাফুল মাখলুকাত" তথা সৃষ্টির সেরা বলে পরিচিত, তা হচ্ছে আল্লাহ পাকের মারেফেতের যোগ্যতা। এ মারেফতই ইহকালে মানুষের সৌন্দর্য ও পরাকাষ্ঠা এবং পরকালে তার সম্পদ ও সরঞ্জাম। মারেফতের যে যোগ্যতা অন্তরকে দান করা হয়েছে, তা অন্য কোন অঙ্গকে দান করা হয়নি। কেননা, আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করা, তাঁকে চেনা, তাঁর জন্যে কাজ করা এবং তাঁর দিকে ধাবিত হওয়া– এগুলো অন্তরেরই কাজ। হাযিরযোগ্য বস্তুসমূহের কাশ্ফও অন্তরের সাথেই সম্পৃক্ত। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁর হাতিয়ার, অনুগামী ও খেদমতগার মাত্র। অন্তর এগুলোকে এমনভাবে কাজে লাগায়, যেমন মালিক গোলামকে এবং শাসক শাসিতকে কাজে লাগায়। মোট কথা, আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব কিছু থেকে মুক্ত থাকলে অন্তরই আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণীয়। পক্ষান্তরে অন্যের প্রতি অধিক নিবিষ্ট হলে এ অন্তর আল্লাহ তাআলা থেকে আড়াল হয়ে যায়। অন্তরের সাথেই হিসাব-নিকাশের সম্পর্ক এবং অন্তরকে সম্বোধন করেই আদেশ ও নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং স্বচ্ছতা ও আত্মশুদ্ধি নসীব হয়ে গেলে অন্তর সাফল্য লাভ করে এবং অপবিত্রতা ময়লার মধ্যে পড়ে থাকলে অন্তর দুর্ভাগ্য ও নৈরাশ্যের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়। সারকথা, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য অন্তরই করে এবং বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কেবল এবাদতের কারণে নূর ছড়িয়ে পড়ে।

পক্ষান্তরে গোনাহ এবং অবাধ্যতাও অন্তরেরই কাজ। তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পাপ কর্মের চিহ্ন ফুটে উঠে। অন্তরের আলো ও তমসা থেকেই বাহ্যিক সৌন্দর্য এবং অপকৃষ্টতা প্রকাশ পায়। কেননা, পাত্র থেকে তাই টপকে পড়ে, যা তার মধ্যে থাকে। মানুষ যখন তার অন্তরকে জেনে নেয়, তখন সে নিজের সম্পর্কে জ্ঞানী হয়ে যায়। নিজের সম্পর্কে জ্ঞান লাভের উপরই আল্লাহ তাআলার মারেফত ভিত্তিশীল। অন্তর সম্পর্কে অজ্ঞান হলে মানুষ নিজের সম্পর্কে অজ্ঞান থেকে যায়। ফলে, সে আল্লাহ তাআলাকেও চিনতে পারে না। অধিকাংশ মানুষ তাদের অন্তর সম্পর্কে অজ্ঞ এবং আল্লাহ তাদের ও তাদের অন্তরের মাঝে আড়াল হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন ঃ إِنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মধ্যে আড়াল হয়ে যান। আল্লাহ তাআলার আড়াল হওয়ার অর্থ, তিনি অন্তরকে "মুশাহাদা" (প্রত্যক্ষকরণ) "মুরাকাবা" (ধ্যানমগ্নতা) ও অন্তর্গত গুণাবলী অনুধাবন করতে দেন না। তিনি এটা জানতে দেন না যে, অন্তর আল্লাহ তাআলার দু'অঙ্গুলির মধ্যে কিভাবে ঘুরাফেরা করে, কিভাবে সে মাঝে মাঝে সর্বনিম্ন স্তরের দিকে ঝুঁকে পড়ে শয়তান হয়ে যায় এবং মাঝে মাঝে সর্বোচ্চ স্তরের দিকে ধাবমান হয়ে নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণের স্তরে উন্নীত হয়ে যায়। যেব্যক্তি ফেরেশতাসুলভ গুণাবলী অর্জনের আশায় আপন অন্তরের অবস্থা জানার চেষ্টা করে না, সে তাদেরই একজন, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 'তারা আল্লাহকে বিস্মৃত হয়েছে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। এরাই পাপাচারী।'

অতএব বুঝা গেল, অন্তরকে চেনা এবং তার গুণাবলীর স্বরূপ উদঘাটন করা আসল ধর্ম এবং আধ্যাত্ম পথের বুনিয়াদ। আমরা এ গ্রন্থের প্রথমার্ধে বাহ্যিক অঙ্গ সম্পর্কিত এবাদত ও লেনদেনের অবস্থা লিপিবদ্ধ করেছি, যাকে "এলমে যাহের" বলা হয়। দ্বিতীয়ার্ধে অন্তর ধ্বংসকারী ও উদ্ধারকারী অবস্থাসমূহ বর্ণনা করার ওয়াদা করেছিলাম। অন্তরের এ সকল অবস্থা জানার নাম "এলমে বাতেন।" উপরোক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এক্ষণে এলমে বাতেন শুরু করার পূর্বে দুটি পরিচ্ছেদ লেখা জরুরী হয়ে পড়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে অন্তরের আশ্চর্যজনক গুণাবলী ও চরিত্র বর্ণিত হবে এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অন্তরের আধ্যাত্মিক সাধনা ও তার চরিত্র শুদ্ধির উপায় বিবৃত হবে। এখন আমরা অন্তরের রহস্যাবলী চলতি বর্ণনাভঙ্গিতে উল্লেখ করছি, যাতে দ্রুত হৃদয়ঙ্গম হয়। নতুবা অন্তরের ঊর্ধ্বজগত সম্পর্কিত আশ্চর্য অবস্থাসমূহ প্রায়শ হৃদয়ঙ্গম হয় না।

প্রথম পরিচ্ছেদ

অন্তরের রহস্যাবলী

প্রকাশ থাকে যে, নফস, রূহ, কলব ও আকল– ধ্বংসকারী ও উদ্ধারকারী বিষয়সমূহের আলোচনায় ব্যবহৃত এই শব্দ চতুষ্টয়ের অর্থের বিভিন্নতা ও এদের প্রতীক সম্পর্কে কম আলেমই অবগত আছেন। এদের অর্থ না জানা এবং বিভিন্ন ও অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার অবস্থা না জানার কারণেই অধিকাংশ ভ্রান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাই আমরা এসব শব্দের সেই অর্থ বর্ণনা করব, যার সাথে আমাদের উদ্দেশ্য সম্পৃক্ত।

প্রথম শব্দ 'কলব', এর অর্থ দু'টি। এক, বক্ষস্থলের বাম দিকে অবস্থিত লম্বা ত্রিকোণ মাংসপিন্ড। এর মাঝখানে শূন্যগর্ভতা আছে, যাতে কাল রক্ত থাকে। এটাই রূহের উৎস ও আকর, কিন্তু এর আকার-আকৃতি বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এটা ডাক্তারদের কাজ। এ ধরনের কলব তথা হৃদয় চতুষ্পদ জন্তু এমনকি মৃতদের মধ্যেও থাকে। কলবের দ্বিতীয় অর্থ, এটি একটি আধ্যাত্মিক লতীফা (সূক্ষ্ম বিষয়), উপরোক্ত শারীরিক কলবের সাথে এই লতীফার সম্পর্ক আছে। এ লতীফাটিই মানুষের স্বরূপ, বোধশক্তির আওতাভুক্ত, আলেম, সম্বোধিত ও তিরস্কৃত। হিসাব-নিকাশের সম্পর্কও এর সাথেই। শারীরিক কলবের সাথে এই লতীফার যে সম্পর্ক, তা অনুধাবন করতে অধিকাংশ মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ঘুরপাক খেয়ে যায়। কেননা, শারীরিক কলবের সাথে এর সম্পর্ক গুণীর সাথে গুণাবলীর সম্পর্কের মত, অথবা যন্ত্রপাতির সাথে কারিগরের সম্পর্কের মত, অথবা গৃহের সাথে গৃহবাসীর সম্পর্কের মত। আমরা দু'কারণে এই লতীফার স্বরূপ বর্ণনা করছি না। প্রথম, এ বিষয়টি "উলুমে মুকাশাফা" তথা অদৃশ্য রহস্যাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত, যা আমাদের এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নয়। দ্বিতীয়, এ সম্পর্কিত তথ্যানুসন্ধান রূহের ভেদ ফাঁস হয়ে যাওয়ার উপর নির্ভরশীল। অথচ এ ভেদ সম্পর্কে রসূলে করীম (সঃ) কিছুই বলেননি। সুতরাং অন্যদেরও এসম্পর্কে মুখ খোলা অনুচিত। এ গ্রন্থে আমরা কেবল এ লতীফার গুণাবলী ও অবস্থা বর্ণনা করব। কেননা, এলমে মোয়ামালা এর উপরই ভিত্তিশীল। এতে স্বরূপ বর্ণনা করার কোন প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয় শব্দ রূহেরও দু' অর্থ। প্রথম, রূহ একটি সূক্ষ্ম দেহ, যার উৎস শারীরিক কলবের শূন্যগর্ভ। এই শূন্যগর্ভ থেকে এটা রক্তবাহী ধমনীর মাধ্যমে দেহের সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। দেহে এই রূহের ছড়িয়ে পড়া এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে জীবন ও পঞ্চইন্দ্রিয় দান করা এমন, যেমন কোন গ্রহে একটি প্রদীপ রেখে দেয়া হলে তার আলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং যেখানেই এই আলো পৌঁছে, সে স্থানই উজালা হয়ে যায়। সুতরাং রূহ্ প্রদীপসদৃশ এবং জীবন আলোসদৃশ। রূহের এই অর্থ হচ্ছে চিকিৎসাবিদগণের পরিভাষা। এ অর্থ বর্ণনা করা আমাদের লক্ষ্য নয়। রূহের দ্বিতীয় অর্থ, রূহ মানুষের মধ্যে একটি বোধশক্তিসম্পন্ন লতীফা। কলবের দ্বিতীয় অর্থে আমরা যে ব্যাখ্যা পেশ করেছি, এখানেও সেই ব্যাখ্যাই উদ্দেশ্য। নিম্নোক্ত আয়াতে রূহের এই অর্থই বুঝানো হয়েছে ঃ

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي –বলে দিন, রূহ্ আমার পালনকর্তার আদেশের অন্তর্ভুক্ত।

রূহের এই দ্বিতীয় অর্থই অত্র গ্রন্থে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

তৃতীয় শব্দ হচ্ছে নফ্স। এটি একাধিক অর্থে অভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে দু'টি অর্থ আমাদের উদ্দেশ্যের অনুকূলে। প্রথম, মানুষের নফ্স এমন একটি বস্তু, যা ক্রোধশক্তি ও কামশক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুফীগণের মধ্যে এই অর্থ অধিক প্রচলিত। তাদের মতে নফসের মধ্যেই মানুষের নিন্দনীয় গুণাবলী একত্রিত আছে। এ কারণেই তারা বলেন, নফসের বিরুদ্ধে সাধনা করা এবং নফ্সকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়া উচিত। হাদীসে এই নফস সম্পর্কেই বলা হয়েছে– সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু হচ্ছে তোমার নফ্স, যা তোমার পার্শ্বে রয়েছে। নফসের দ্বিতীয় অর্থ, নফ্স একটি খোদায়ী লতীফা, যা অবস্থাভেদে বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত হয়। বাস্তবে এটাই মানুষ। মানুষ যখন কামনাকে প্রতিরোধ করে, তখন এই নফসের চাঞ্চল্য দূর হয়ে যায় এবং আনুগত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তখন একে "নফ্সে মুতমায়িন্নাহ্" (প্রশান্ত চিত্ত) বলা হয়। যার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً .

–হে প্রশান্ত চিত্ত, তুমি তোমার পালনকর্তার কাছে ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে।

কেননা, নফসের প্রথম অর্থের দিক দিয়ে তার আল্লাহ তাআলার কাছে ফিরে আসা কল্পনা করা যায় না; বরং সে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে দূরে চলে যায় এবং শয়তানের দলভুক্ত হয়ে যায়। আর যদি আনুগত্যের উপর নফসের প্রতিষ্ঠা পূর্ণ না হয়, কিন্তু কামনা-বাসনা প্রতিরোধ করতে থাকে, তবে তাকে বলা হয় "নফ্সে লাওয়ামা" (তিরস্কারকারী নফস)। কেননা, সে তার মালিককে আল্লাহর এবাদতে ত্রুটি করতে দেখে তিরস্কার করে। কোরআন পাকে এ নফসেরও উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে ঃ

لَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ –কসম তিরস্কারকারী নফসের।

আর যদি নফস কামনা-বাসনার প্রতিরোধ না করে; বরং কামপ্রবৃত্তি ও শয়তানের দাস হয়ে যায়, তবে তাকে বলা হয়, "নফ্সে আম্মারা বিস্সূ" অর্থাৎ, জোরেজবরে কুকর্মের আদেশকারী নফস। আল্লাহ তাআলা হযরত ইউসুফ (আঃ) অথবা আযীযে মিসরের পত্নীর ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ –আমি আমার নফসকে নির্দোষ বলি না। কেননা, নফ্স জোরেশোরে কুকর্মের আদেশ করে।

চতুর্থ শব্দ "আকল"। এটাও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে দুটি অর্থের সাথে আমাদের উদ্দেশ্য জড়িত। প্রথম, কখনও এর অর্থ নেয়া হবে একটি শিক্ষামূলক গুণ, যার স্থান কলব। দ্বিতীয় অর্থ, কখনও আকলের অর্থ নেয়া হয় শিক্ষার বোধশক্তি। এমতাবস্থায় আকলও উল্লিখিত লতীফা হবে।

সুতরাং আকল বলে কখনও শিক্ষাগুণ এবং কখনও শিক্ষাগুণের পাত্র বুঝানো হয়। নিম্নোক্ত হাদীসে দ্বিতীয় অর্থই বুঝানো হয়েছে ঃ اول ما خلق الله العقل –আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম আকল সৃষ্টি করেছেন। কেননা, শিক্ষাগুণ তো আপনা-আপনি বিদ্যমান হতে পারে না। তার বিদ্যমান হওয়ার জন্যে পাত্র দরকার। সুতরাং এই পাত্র তার পূর্বে অথবা তার সাথে সাথে সৃষ্ট হওয়া জরুরী। নতুবা তাকে সম্বোধন করা হবে না। এ হাদীসেই আছে, আল্লাহ্ তাআলা আকলকে বললেন ঃ সামনে এসো। সে সামনে এলো। আবার বললেন ঃ পিঠ ফিরিয়ে নাও। সে পিঠ ফিরিয়ে নিল।

এখন জানা উচিত, ১। কলব, ২। নফস, ৩। রূহ্ ও ৪। আকল –এই চারটি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ, শারীরিক কলব, শারীরিক রূহ, কাম-নফস ও জ্ঞান। একটি পঞ্চম অর্থ আছে, যা

এই চারটি শব্দেরই অভিন্ন অর্থ; অর্থাৎ মানবীয় বোধশক্তির লতীফা। সুতরাং শব্দ হল চারটি এবং অর্থ পাঁচটি। পঞ্চম অর্থটি প্রত্যেক শব্দের অভিন্ন অর্থ বিধায় প্রত্যেক শব্দের অর্থ দু'টি। কোরআন মজীদ ও হাদীস শরীফে ব্যবহৃত কলবের অর্থ সেই লতীফা, যদ্দ্বারা মানুষ বস্তুনিচয়ের স্বরূপ অবগত হয়। রূপকভাবে এর দ্বারা মানুষের বক্ষস্থিত কলবও বুঝানো হয়। কেননা, এই লতীফা ও শারীরিক কলবের মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে। শারীরিক কলবের মধ্যস্থতায়ই এই কলব মানুষের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কাজে নিয়োজিত করে। শারীরিক কলব যেন এই লতীফার পাত্র ও বাহন। এ কারণেই সহল তস্তরী বলেন ঃ কলব হচ্ছে আরশ এবং বক্ষ কুরসী। অর্থাৎ শারীরিক কলব ও বক্ষ হচ্ছে লতীফার রাজধানী, যেখান থেকে লতীফার কার্যক্রম শুরু হয়।

কলব তথা অন্তরের লশকর

প্রকাশ থাকে যে, অন্তর, রূহ ও অন্যান্য জগতে আল্লাহ্ তাআলার লশকর এত বেশী যে, এগুলোর স্বরূপ ও গণনা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ –আপনার পালনকর্তার লশকর তিনি ব্যতীত কেউ জানে না।

এখন আমরা অন্তরস্থ আল্লাহ্ তাআলার কয়েকটি লশকর সম্পর্কে বর্ণনা করছি। কেননা, আমাদের আলোচনা অন্তর সম্পর্কেই।

অন্তরের দুটি লশকর। এক, যা চর্মচক্ষে দেখা যায় এবং দুই, যা অন্তশ্চক্ষে অনুধাবন করা যায়। এই উভয় প্রকার লশকর অন্তরের জন্যে খাদেম ও সাহায্যকারী। যে লশকর চোখে দেখা যায়, সেগুলো হচ্ছে হাত, পা, জিহ্বা, চক্ষু কর্ণ, নাসিকা এবং অন্যান্য সকল বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। অন্তর এগুলোকে যেভাবে চায় কাজে লাগায়। অন্তরের আনুগত্য করার জন্যেই এগুলো সৃজিত হয়েছে। অন্তরের বিরুদ্ধাচরণ করার ক্ষমতা এদের নেই এবং এরা অন্তরের বৈরীও হতে পারে না। উদাহরণত, অন্তর যখন চক্ষুকে খোলার আদেশ দেয়, তখন সে খুলে যায়। থাকে চলার আদেশ করলে সে চলতে থাকে। জিহ্বাকে বলার আদেশ করলে সে বলতে থাকে। অন্য সকল অঙ্গের অবস্থাও তথৈবচ। অন্তরের জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়ের আনুগত্য এমন, যেমন আল্লাহ্ তাআলার জন্যে ফেরেশতাদের আনুগত্য। কারণ, ফেরেশতাগণও আনুগত্যের জন্যেই সৃজিত। তারা আনুগত্যের খেলাফ করার ক্ষমতা রাখে না। কোরআনের ভাষায় তাদের অবস্থা এই ঃ

لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ –তারা আল্লাহ্র আদেশের নাফরমানী করে না এবং তাই করে, যা করার আদেশ হয়।

তবে পার্থক্য হচ্ছে, ফেরেশতারা আপন আনুগত্য ও খোদায়ী আদেশ পালনের বিষয় অবগত থাকে, কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আনুগত্য দূরের কথা, আপন অস্তিত্ব সম্পর্কেও অবগত নয়। বলাবাহুল্য, অন্তরকে সৃষ্টি করা হয়েছে একটি সফরের জন্যে। সেই সফর হচ্ছে খোদায়ী মারেফত এবং খোদায়ী দীদারের মনযিল অতিক্রম করার সফর।

আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ –আমি জ্বিন ও মানবকে কেবল আমার এবাদতের জন্যে সৃষ্টি করেছি।

অন্তরের এই সফরের জন্যে সাহায্যকারীর প্রয়োজন ছিল। তাই অন্তরকে সওয়ারী, পাথেয় ইত্যাদি দান করা হয়েছে। দেহ হচ্ছে অন্তরের সওয়ারী এবং পাথেয় জ্ঞান ও শিক্ষা। দুনিয়াতে বসবাস করা ছাড়া আল্লাহ্র পথে চলা বান্দার জন্যে সম্ভবপর নয়। কেননা, বড় মনযিলে পৌঁছার জন্যে ছোট মনযিল অতিক্রম করা জরুরী। তাই দুনিয়াকে পরকালের শস্যক্ষেত্র বলা হয়েছে। অন্তরকে ইহজগতে অবশ্যই পাথেয় সংগ্রহ করতে হবে। দেহরূপী সওয়ারীর সাহায্যে সে ইহজগতে পৌঁছে যায়। সুতরাং দেহের হেফাযত ও রক্ষণাবেক্ষণ অত্যাবশ্যক। হেফাযত হচ্ছে দেহকে অনুকূল খাদ্য সরবরাহ করা এবং ধ্বংসের কারণাদি দূর করা। এদিক দিয়ে খাদ্য হাসিল করার জন্যে দুটি খাদেমের প্রয়োজন দেখা দিল। একটি বাতেনী, যার নাম ক্ষুধা ও মনের স্পৃহা এবং অপরটি যাহেরী অর্থাৎ, হাত ইত্যাদি, যদ্দ্বরা খাদ্য অর্জিত হয়। এছাড়া ধ্বংসের কারণ থেকে বাঁচার জন্যে দুটি লশকরের প্রয়োজন দেখা দিল। একটি বতেনী, যাকে ক্রোধ বলা হয়। যার কারণে শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়া হয় এবং অপরটি যাহেরী অর্থাৎ, হাত, পা ইত্যাদি। দেহে এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন হাতিয়ারের মত কাজ করে। এখন যেব্যক্তি খাদ্যের মুখাপেক্ষী, সে যদি খাদ্যের অবস্থা না জানে, তবে কেবল খাদ্যের স্পৃহা ও ক্ষুধায় কাজ হবে না। তাই খাদ্যের অবস্থা জানার জন্যে অন্তরকে দু'টি খেদমতগার দেয়া হয়েছে। একটি বাতেনী অর্থাৎ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধি এবং অপরটি যাহেরী অর্থাৎ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বাহ্যিক স্থান তথা কর্ণ, চক্ষু, নাসিকা ইত্যাদি।

সারকথা, অন্তরের খাদেম তিন প্রকার। প্রথম প্রকার, যা অন্তরকে কোন বস্তুর প্রতি উৎসাহিত করে– উপকার লাভের প্রতি, যেমন ক্ষুধা;

অথবা ক্ষতি দূর করার প্রতি, যেমন ক্রোধ। এই প্রকার খাদেমকে এরাদা তথা ইচ্ছাও বলা হয়। দ্বিতীয় প্রকার, যা উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গতিশীল করে। একে বলা হয় ক্ষমতা ও শক্তি। এটা সমস্ত অঙ্গে বিশেষত শিরা-উপশিরার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। তৃতীয় প্রকার হচ্ছে দেখা, ঘ্রাণ লওয়া, শ্রবণ করা, আস্বাদন করা ও স্পর্শ করার শক্তি, যা নির্দিষ্ট অঙ্গসমূহের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। এই প্রকারের নাম উপলব্ধি জ্ঞান। এসব বাতেনী লশকরের মধ্য থেকে প্রত্যেকটির জন্যে যাহেরী লশকরও রয়েছে। অর্থাৎ, রক্ত, মাংস, চর্বি, অস্থি ইত্যাদি দ্বারা গঠিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। উদাহরণতঃ স্পর্শ শক্তির সম্পর্ক অঙ্গুলির সাথে এবং দর্শন শক্তির সম্পর্ক চোখের সাথে। আমরা বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা করব না। কেননা, এগুলো বাহ্যজগত। আমরা বরং অন্তরের সেসব লশকর সম্পর্কে আলোচনা করব, যেগুলো চোখে দেখা যায় না। অর্থাৎ, তৃতীয় প্রকার উপলব্ধি শক্তি সম্পর্কে। এই শক্তি দু'প্রকার। প্রথম প্রকার সেসব শক্তি, যাদের ঠিকানা বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; অর্থাৎ, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি বাহ্যিক পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে নিহিত। দ্বিতীয় প্রকার সেসব শক্তি, যাদের বাসস্থান বাতেনী মনযিলসমূহের মধ্যে নিহিত; অর্থাৎ, মস্তিষ্কের কোটরসমূহের মধ্যে। এই দ্বিতীয় প্রকারও পাঁচ ভাগে বিভক্ত। কেননা, মানুষ কোন বস্তুকে দেখে যখন চক্ষু বন্ধ করে নেয় তখন সে সেই বস্তুর চিত্র মনের মধ্যে পায়। একে বলা হয় "খেয়াল" তথা কল্পনা। এর পর এই চিত্র কতক বিষয় মনে রাখার মাধ্যমে মানুষের সাথে থাকে। একে বলা হয় স্মরণশক্তি। এর পর সে এই স্মরণ করা বিষয় সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে এবং কতককে কতকের সাথে মিলায়। ফলে যা ভুলে গিয়ে থাকে তা স্মরণ হয়ে যায়। কতক চিত্র হুবহু মনের মধ্যে থেকে যায়। এর পর সে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল বিষয় অভিন্ন চেতনার মাধ্যমে আপন কল্পনায় একত্রিত করে নেয়। এ থেকে জানা গেল, মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে যে সকল শক্তি রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে অভিন্ন চেতনা, কল্পনা, চিন্তা, জল্পনা ও স্মরণ রাখা। আল্লাহ তাআলা এসব শক্তি সৃষ্টি না করলে মস্তিষ্ক এগুলো থেকে খালি থাকত। যেমন– হাত, পা এগুলো থেকে খালি রয়েছে।

অন্তরের আভ্যন্তরীণ খাদেম

জানা উচিত, ক্রোধ ও কামনা –অন্তরের এ দুটি খাদেম কখনও পুরা মাত্রায় অন্তরের আনুগত্য করে। তখন অন্তর অধ্যাত্ম পথে চলার ব্যাপারে এগুলো থেকে সাহায্য পায়। বরং আল্লাহর দিকে সফরে এ দুটিকে উত্তম সঙ্গী মনে করে, কিন্তু মাঝে মাঝে এ দুটি খাদেম অন্তরের অবাধ্য ও

বিদ্রোহী হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত অন্তরকে নিজেদের গোলাম বানিয়ে নেয়। তখন তারা অন্তরের বরবাদ হওয়ার কারণ হয়ে যায়। ফলে অন্তর চিরন্তন সৌভাগ্য লাভের সফর থেকে বিরত থাকে, কিন্তু অন্তরের আরও সাহায্যকারী রয়েছে; যেগুলোকে শিক্ষা, প্রজ্ঞা ও চিন্তা-ভাবনা বলা হয়। এহেন সংকট মুহূর্তে ক্রোধ ও বাসনার মোকাবিলা করার জন্যে এগুলোর সাহায্য নেয়া উচিত। কেননা, ক্রোধ ও কামনা কখনও শয়তানের দলে ভিড়ে অন্তরের উপর অনন্তর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। যদি অন্তর উপরোক্ত খাদেমদের সাহায্য না নেয় এবং ক্রোধ ও কামনার অনুগত হয়ে যায়, তাহলেও ধ্বংস ও প্রকাশ্য ক্ষতির আশংকা থেকে যায়। অধিকাংশ লোককে দেখা যায়, তাদের বিবেক-বুদ্ধি কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্যে অনেক কৌশল খুঁজে ফিরে। অথচ বুদ্ধির প্রয়োজন মিটানোর ব্যাপারে কামনার অনুগত থাকা সমীচীন। এখন আমরা তিনটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এ বিষয়টির ব্যাখ্যা পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরছি।

প্রথম দৃষ্টান্ত, মনে করুন মানুষের নফস অর্থাৎ, পূর্ববর্ণিত লতীফা বাদশাহ্, দেহ তার রাজধানী, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার কর্মী ও আমলা, বিবেকশক্তি তার হিতাকাঙ্ক্ষী উযীর, ক্রোধ তার রাজধানীর প্রধান পুলিশ কর্মচারী এবং কামনা– বাসনা তার দুশ্চরিত্র গোলাম, যে এই রাজধানী শহরে খাদ্যশস্য ইত্যাদি আনয়ন করে। সে এত ধূর্ত, মিথ্যুক ও নোংরা যে, শুভাকাঙ্ক্ষারূপে আগমন করে, কিন্তু তার শুভাকাঙ্ক্ষার মধ্যে আদি-অন্ত ষড়যন্ত্র ও মারাত্মক বিষ নিহিত থাকে। বিচক্ষণ উযীরের সাথে কথায় কথায় বিবাদ করা তার অভ্যাস। এমনকি, কোন মুহূর্ত তার কথা কাটাকাটি থেকে খালি থাকে না। সুতরাং এমতাবস্থায় যদি বাদশাহ্ তার রাজত্ব পরিচালনায় উযীরের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে এবং এই দুশ্চরিত্র গোলামের কথাবার্তা প্রত্যাখ্যান করে, তবে নিঃসন্দেহে রাজকার্য সঠিকভাবে ও ইনসাফ সহকারে পরিচালিত হবে। এক্ষেত্রে বাদশাহ্কে বুঝে নিতে হবে, গোলামের বিরুদ্ধাচণের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত। উযীরের মন রক্ষার্থে প্রধান পুলিশ কর্মকর্তাকেও উপদেশ দিতে হবে এবং উযীরের পক্ষে থেকে তাকে এই দুশ্চরিত্র গোলাম ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের উপর মোতায়েন করতে হবে, যাতে গোলাম সীমালঙ্ঘন করতে না পারে এবং পরাভূত ও শাসিত থেকে যায়! অনুরূপভাবে যদি নফস বুদ্ধির সাহায্য নেয়, ক্রোধকে কামনার উপর চাপিয়ে রাখে এবং কখনও ক্রোধকে দমন করার জন্যে কামনার সাহায্য নেয়, তবে নফসের সকল শক্তি সমতার উপর কায়েম থাকবে এবং চরিত্র উন্নত হবে। যেব্যক্তি এ পন্থা বর্জন

করবে, সে সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

افرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم

–তুমি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছ, যে তার খেয়াল-খুশীকে আপন মাবুদ করে নিয়েছে। আল্লাহ্ জেনে-শুনেই তাকে পথভ্রান্ত করেছেন।

অথবা এরশাদ হয়েছে ঃ

واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث

–এবং সে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেছে। অতএব তার দৃষ্টান্ত কুকুরের মত। তার উপর বোঝা চাপালে সে হাঁপায় এবং বোঝা না চাপিয়ে ছেড়ে দিলেও হাঁপায়।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার নফসকে কামনা থেকে ফিরিয়ে রাখে, তার সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে ঃ

واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى

–আর যে তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং আপন নফসকে খেয়াল-খুশী থেকে বিরত রাখে, জান্নাতই তার ঠিকানা।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত, মনে করুন, দেহ একটি শহর এবং এর বিচক্ষণ প্রশাসক হচ্ছে বুদ্ধি। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়সমূহ এই শহরের লশকর। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এর প্রজা এবং কামনা ও ক্রোধ এই শহরের দুশমন। তারা এই শহরে তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে এবং প্রজাদেরকে ধ্বংস করতে ইচ্ছুক। এখন দেহকে একটি পরিখা মনে করা উচিত, যার মধ্যে বাদশাহ স্বয়ং রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে বিদ্যমান রয়েছে। সে যদি যুদ্ধ করে দুশমনকে বিতাড়িত অথবা পরাভূত করে দেয়, তবে তার এ কাজ আল্লাহ্র দরবারে পছন্দনীয় হবে। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

فضل الله المجهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة

–যারা ধন ও প্রাণের বিনিময়ে জেহাদ করে, আল্লাহ তাদেরকে গৃহে উপবিষ্টদের উপর অধিক মর্যাদা দান করেন।

পক্ষান্তরে বাদশাহ যদি পরিখা বিনষ্ট ও প্রজাদেরকে বিপন্ন করে দেয়, তবে সে সর্বোচ্চ দরবারে নিন্দার পাত্র হবে এবং তাকে এর শাস্তি দেয়া হবে। এক হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে -এরূপ ব্যক্তিকে কেয়ামতের দিন বলা হবে, হে দুষ্টমতি রক্ষক, তুমি গোশত খেয়েছ এবং দুধ পান করেছ, কিন্তু হারানো উদ্ধার করনি এবং ভগ্নাবস্থাকে ঠিক করনি। আজ আমি তোমার কাছ থেকে বিনিময় গ্রহণ করব। এই জেহাদের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে নিম্নোক্ত হাদীসে ঃ

رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر

–আমরা ছোট জেহাদ থেকে বড় জেহাদের দিকে ফিরে এসেছি।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত, বুদ্ধিকে একজন আরোহী মনে করা উচিত, যার ইচ্ছা শিকার করার। কামনাকে তার ঘোড়া এবং ক্রোধকে তার কুকুর খেয়াল করা দরকার। এখন যদি আরোহী পারদর্শী হয় এবং ঘোড়া ও কুকুর প্রশিক্ষাণপ্রাপ্ত হয়, তবে অবশ্যই অভীষ্ট অর্জিত হবে। পক্ষান্তরে যদি আরোহী স্বয়ং আরোহণ বিদ্যায় মূর্খ হয় এবং ঘোড়া অবাধ্য ও কুকুর উন্মাদ হয়, তবে না ঘোড়া তার কথামত কাজ করবে এবং না কুকুর তার ইশারায় শিকারের দিকে ধাবিত হবে। এরূপ ব্যক্তির জন্যে শিকার করা দূরের কথা, প্রাণ রক্ষা করাই কঠিন হয়ে যাবে। এই দৃষ্টান্তে আরোহীর অনভিজ্ঞতা মানে মানুষের মূর্খতা ও জ্ঞানশক্তির অভাব, ঘোড়ার অবাধ্যতা মানে কামনার প্রাবল্য, বিশেষত উদরের কামনা ও যৌন কামনার প্রাবল্য এবং কুকুরের উন্মত্ততার মানে ক্রোধের প্রাবল্য। আল্লাহ্ তাআলা আপন কৃপায় মানুষকে এগুলো থেকে রক্ষা করুন।

মানব অন্তরের বৈশিষ্ট্য

প্রকাশ থাকে যে, আমরা যে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয় সম্পর্কে বর্ণনা করেছি, সেগুলো আল্লাহ্ তাআলা সকল জন্তু-জানোয়ারকেও দান করেছেন। উদাহরণতঃ কাম-ক্রোধ এবং বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয় সকল প্রাণীরই অর্জিত আছে। সেমতে ছাগল যখন ব্যাঘ্রকে দেখে ফেলে, তখন তার শত্রুতা মনে মনে আঁচ করে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করে। এ থেকে জানা যায়, পশুর মধ্যেও অভ্যন্তরীণ উপলব্ধি বিদ্যমান আছে।

এখন আমরা এমন বিষয় বর্ণনা করব, যা একান্তভাবে মানুষের মধ্যে

পাওয়া যায়, যার কারণে সে সৃষ্টির সেরা এবং খোদায়ী নৈকট্য লাভের যোগ্য হয়েছে। এরূপ বিষয় দুটি । একটি জ্ঞান ও অপরটি ইচ্ছা। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক বিষয়াদির জ্ঞান না ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের গণ্ডির মধ্যে দাখিল, না জন্তু-জানোয়ার এতে মানুষের সাথে শরীক। বরং সামগ্রিক জাজ্বল্যমান বিষয়সমূহের জ্ঞানও মানুষের বৈশিষ্ট্য। উদাহরণতঃ মানুষ এই জ্ঞান রাখে যে, এক ব্যক্তির একই সময়ে একই অবস্থায় দু'স্থানে বিদ্যমান হওয়া অসম্ভব। ইচ্ছার মানে, মানুষ যখন জ্ঞান দ্বারা কোন কাজের পরিণতি চিন্তা করে এবং তাতে কল্যাণ দেখে, তখন তার মনে সেই কল্যাণ হাসিল করার একটা আগ্রহ সৃষ্টি হয়। একেই বলা হয়েছে ইচ্ছা। এটা কামনার ইচ্ছার বিপরীত। উদাহরণতঃ কামনা ইনজেকশনের প্রতি অনীহা পোষণ করে, কিন্তু জ্ঞান তার ইচ্ছা করে এবং এর জন্যে টাকা-পয়সা পর্যন্ত ব্যয় করে। যদি আল্লাহ্ তাআলা জ্ঞান সৃষ্টি করতেন এবং ইচ্ছাকে সৃষ্টি না করতেন, তবে জ্ঞানের সিদ্ধান্ত নিষ্ফল হয়ে যেত।

মোটকথা, মানুষের অন্তরস্থিত জ্ঞান ও ইচ্ছা পশুকুলের মধ্যে নেই; বরং প্রথমে শিশুদের মধ্যেও থাকে না। কেননা, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তাদের মধ্যে ইচ্ছার উদ্ভব হয়, কিন্তু কাম, ক্রোধ, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয় সমস্তই তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। হাঁ, শিশুর মধ্যে এসব জ্ঞান অর্জিত হওয়ার দুটি স্তর আছে। প্রথম স্তর হচ্ছে তার অন্তরে জাজ্বল্যমান বিষয়সমূহের জ্ঞান এসে যাওয়া। এই স্তরে প্রমাণসাপেক্ষ বিষয়সমূহের জ্ঞান তার মধ্যে অর্জিত হবে না, কিন্তু সে তা অর্জিত হওয়ার কাছাকাছি চলে যাবে। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে কর্ম, অভিজ্ঞতা ও চিন্তাভাবনার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জিত হওয়া। জ্ঞানের স্তরটি মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ শিখর, কিন্তু এতে অসংখ্য ও অশেষ ধাপ রয়েছে এবং জ্ঞানের আধিক্য ও স্বল্পতার দিক দিয়ে মানুষে মানুষে অনেক তফাৎ হয়। এছাড়া জ্ঞান অর্জনের পন্থার মধ্যেও তফাৎ হয়। কতক অন্তর প্রথম ধাপেই মুকাশাফা ও ইলহাম দ্বারা এ জ্ঞান অর্জন করে নেয়। কতক অন্তর অধ্যবসায় ও শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে অর্জন করে। এতেও অনেকে মেধাবী এবং কতক স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে নবী, আলেম, ওলী ও বিজ্ঞজনের স্তর বিভিন্নরূপ এবং উন্নতির কোন শেষ সীমা নেই। কেননা, জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। এতে সেই পয়গম্বরের মর্যাদা সর্বোচ্চ, যার সামনে সকল স্বরূপ কেবল মুকাশাফা ও ইলহামের মাধ্যমে উদঘাটিত হয়ে যায়। এই সৌভাগ্যের বদৌলতই বান্দা আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভ করে এবং এসব স্তরে

উন্নতি করাই সাধকদের মনযিল। এসব মনযিলের কোন শেষ নেই; বরং প্রত্যেক সাধক যে মনযিলে উপনীত হয়, তার সেই মনযিল ও নীচের মনযিলের অবস্থা জানা থাকে, কিন্তু সম্মুখের মনযিল সম্পর্কে তার কিছুই জানা থাকে না। তবে মাঝে মাঝে গায়েবের প্রতি বিশ্বাসস্বরূপ সেসব মনযিলকে সত্য বলে বিশ্বাস করে; যেমন আমরা নবুওয়ত ও নবীর প্রতি বিশ্বাস রাখি এবং তাঁদের অস্তিত্বকে সত্য বলে জানি; কিন্তু নবুওয়তের স্বরূপ নবী ব্যতীত কেউ জানে না।

আল্লাহ্ তাআলার রহমত সকলের জন্যে ব্যাপক। এতে কারও সাথে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কৃপণতা নেই, কিন্তু এই রহমত সেসব অন্তরে প্রকাশ পায়, যারা রহমতের অপেক্ষায় থাকে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের জীবনের দিনগুলোতে আল্লাহ্ তাআলার রহমতের অনেক প্রবাহ আসে। অতএব তোমরা এর অপেক্ষায় থাক। রহমতের অপেক্ষায় থাকার মানে, অন্তরকে পাক সাফ রাখবে এবং দুশ্চরিত্রতা ও মালিন্য থেকে বেঁচে থাকবে। এই দুশ্চরিত্রতা ও মলিনতার কারণেই কতক অন্তরে খোদায়ী নূর অনুপস্থিত থাকে। নতুবা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোন কার্পণ্য ও বাধা থাকে না। কেননা, অন্তরের অবস্থা পাত্রের মত। পাত্রে যতক্ষণ পানি ভর্তি থাকে, তাতে বায়ু প্রবেশ করতে পারে না। অনুরূপভাবে যখন অন্তর গায়রুল্লাহ্র সাথে ব্যাপৃত থাকে, তখন তাতে খোদায়ী মারেফত প্রবেশ করে না! নিম্নোক্ত হাদীসে এ বিষয়ের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ

لَوْ لَا اَنَّ الشَّيَاطِيْنَ يَحُوْمُوْنَ عَلٰى قُلُوْبِ بَنِىْ اٰدَمَ لَنَظَرُوْا اِلٰى مَلَكُوْتِ السَّمَاءِ

–যদি শয়তান আদম সন্তানদের অন্তরের চারপাশে ঘুরাফেরা না করত, তবে তারা আকাশের ফেরেশতা ও স্বর্গলোক দেখতে পেত। সার কথা, মানুষের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান হচ্ছে আল্লাহ্র সত্তা, তাঁর গুণাবলী ও কর্মের জ্ঞান। এতেই মানুষের পূর্ণতা এবং এই পূর্ণতার কারণে সৌভাগ্য ও খোদায়ী দরবারে উপস্থিতি অর্জিত হয়। সুতরাং যেব্যক্তি তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে এমনভাবে কাজে নিয়োজিত করে, যদ্দ্বারা তার জ্ঞানার্জনে সহায়তা হয়, সে ফেরেশতাদের অনুরূপ এবং তাদের মধ্যে গণ্য হওয়ার যোগ্য। যে সকল মহিলা হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে দেখতে এসেছিল, আল্লাহ তাআলা কোরআনে তাদের এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ঃ مَا هٰذَا بَشَرًا اِنْ هٰذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ

–সে তো মানুষ নয়! সে তো একজন সম্ভ্রান্ত ফেরেশতা!

পক্ষান্তরে যেব্যক্তি তার সমস্ত সাহসিকতা দৈহিক আরাম-আয়েশে ব্যয় করে এবং চতুষ্পদ জন্তুদের মত খেয়ে যায়, সে পশুর স্তরে দাখিল হয়ে নিছক আনাড়ি বলদ হবে, না হয় শূকরের ন্যায় লোভী হবে। অথবা কুকুরের ন্যায় ঘেউ ঘেউকারী হবে। অথবা উটের ন্যায় বিদ্বেষকারী হবে। অথবা চিতাবাঘের ন্যায় দাম্ভিক হবে। অথবা শৃগালের ন্যায় ধূর্ত হবে। এই সবগুলো বিষয় কোন একজনের মধ্যে বিদ্যমান থাকলে সে হবে পুরাপুরি বিতাড়িত শয়তান। মানুষের সৌভাগ্য পূর্ণরূপে এ বিষয়ের মধ্যেই নিহিত যে, সে আল্লাহর দীদারকে নিজের লক্ষ্য স্থির করবে, পরকালকে আবাসস্থল মনে করবে, দুনিয়াকে মনযিল, দেহকে যানবাহন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে খাদেম জ্ঞান করবে এবং বোধশক্তিকে বাদশাহ সাব্যস্ত করবে, যার রাজধানী হচ্ছে অন্তর মস্তিষ্কের অগ্রভাগে অবস্থিত কল্পনাশক্তি হচ্ছে সেই বাদশাহের দূত। কেননা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহের সংবাদ তার কাছে একত্রিত হয়। মস্তিষ্কের পশ্চাদভাগে অবস্থিত স্মরণশক্তি হচ্ছে তার কোষাধ্যক্ষ, জিহ্বা ভাষ্যকার, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লেখক এবং পঞ্চইন্দ্রিয় তার গুপ্তচর। পঞ্চইন্দ্রিয় নিজ নিজ এলাকার সংবাদ একত্রিত করে কল্পনাশক্তির কাছে পৌঁছে দেয়। সে এগুলো কোষাধ্যক্ষ অর্থাৎ, স্মরণশক্তির কাছে সোপর্দ করে। এর পর কোষাধ্যক্ষ বাদশাহ্ অর্থাৎ, বোধশক্তির দরবারে পেশ করে। বাদশাহ রাজত্ব পরিচালনার জন্যে যে সকল সংবাদ জরুরী, সেগুলো গ্রহণ করে নেয়। যে মানুষ নিজেকে এভাবে সক্রিয় রাখে, সে ভাগ্যবান, সফলকাম এবং খোদায়ী নেয়ামতের শোকরকারী হয়। পক্ষান্তরে যে এগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে রাখে, সে হতভাগা, লাঞ্ছিত ও অকৃতজ্ঞ সাব্যস্ত হয়ে পরিণামে আযাব, শাস্তি ও পরকালীন দুর্ভোগের পাত্র হয়ে যায় (নাউযু বিল্লাহ)। আমাদের বর্ণিত এ দৃষ্টান্তের প্রতি হযরত কাব ইবনে আহবার ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করলাম, মানুষের মধ্যে চক্ষু পথপ্রদর্শক, কান রক্ষক, জিহ্বা ভাষ্যকার, হাত লশকরের দু'বাহু, পা দূত এবং অন্তর বাদশাহ। সুতরাং বাদশাহ ভাল হলে তার অনুচরবর্গ ভাল হবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কেও এরূপ বলতে শুনেছি। হযরত আলী (রাঃ) অন্তরের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বলেন ঃ পৃথিবীতে আল্লাহর পাত্র হচ্ছে অন্তর। সেই অন্তর আল্লাহর অধিক প্রিয়, যে নরম, স্বচ্ছ ও শক্ত। অতএব তোমরা মুসলমান ভাইদের সাথে নরম, বিশ্বাসে স্বচ্ছ এবং ধর্মের ব্যাপারে কঠোর

হবে। এতে এই আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে ঃ

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

–তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং পরস্পরে সংবেদনশীল।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব-

مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَوٰةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ

–আয়াতের তফসীরে বলেন, এটা মুমিনের নূর ও তার অন্তরের দৃষ্টান্ত। তিনি- أَوْ كَظُلُمَٰتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ

–আয়াতের তফসীরে বলেন, এটা মোনাফেকের অন্তরের দৃষ্টান্ত। যায়েদ ইবনে আসলাম কোরআনে উল্লিখিত "লওহে মাহফুয" (সংরক্ষিত ফলক) সম্পর্কে বলেন, এটা মুমিনের অন্তর। হযরত সহল তস্তরী বলেন ঃ অন্তর ও বক্ষের উপমা হচ্ছে আরশ ও কুরসী।

অন্তরের গুণাবলী ও উদাহরণ ঃ জানা উচিত, মানব সৃষ্টি ও গঠনে চারটি মিশ্রণ আছে, যে কারণে তার মধ্যে হিংস্র, শয়তানী, পৈশাচিক ও স্বর্গীয় –এই চার প্রকার গুণের সমাবেশ ঘটেছে। মানুষের গঠনে ক্রোধ আছে বিধায় সে হিংস্র প্রাণীসুলভ কাজ-কর্ম করে এবং শত্রুতা, বিদ্বেষ, হাতাহাতি ও গালিগালাজ করে। কামভাবের মিশ্রণ থাকার কারণে সে পশুসুলভ কর্ম অর্থাৎ, লোভ, লালসা, হিংসা ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়। মানুষ স্বয়ং স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে খোদায়ী আদেশ; যেমন আল্লাহ বলেন ঃ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي –বলুন, রূহ্ আমার পালনকর্তার আদেশের অংশ। এ কারণে সে প্রভুত্ব দাবী করে। এছাড়া সে স্বাতন্ত্র্য, প্রভুত্ব, উপাস্যতা ও নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি বিষয় পছন্দ করে। সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। তাকে জ্ঞানী বলা হলে সে পুলকিত হয় এবং মূর্খ বলা হলে নাখোশ হয়। বলাবাহুল্য, সকল বিষয়ের স্বরূপ অবগত হওয়া এবং সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করা পালনকর্তার অন্যতম গুণাবলী। মানুষের মধ্যে শয়তানী গুণাবলীও রয়েছে, যদ্দরুন সে দুষ্ট বলে কথিত হয়। সে নিজের মতলব ছলচাতুরী, প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার মাধ্যমে হাসিল করে এবং উপকারের প্রতিদানে অপকার করে। এগুলো শয়তানের স্বভাব।

মানুষের উপরোক্ত চারটি মিশ্রণ তার অন্তরে সমাবেশিত আছে। সুতরাং তার মজ্জার মধ্যে যেন শূকর, কুকুর, শয়তান ও প্রজ্ঞাশীল সত্তা বিদ্যমান রয়েছে। শূকর হচ্ছে তার কামস্বভাব। কেননা, শূকর তার বর্ণ ও

আকৃতির কারণে নিন্দনীয় নয়; বরং অতিরিক্ত লোভ ও অধিক আহারের কারণে সে নিন্দার পাত্র। কুকুর হচ্ছে মানুষের ক্রোধ। কেননা, কুকুর যে দংশন করে, তা তার আকার-আকৃতির কারণে নয়; বরং তার মধ্যে হিংস্রতা ও শত্রুতা নিহিত থাকার কারণে। এমনিভাবে মানুষের অভ্যন্তরেও হিংস্র প্রাণীর মত কষ্ট প্রদান ও ক্রোধ এবং শূকরের মত লোভ-লালসা মওজুদ রয়েছে। সুতরাং শূকর তার লোভ-লালসার কারণে অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কাজের প্রতি আহ্বান করে এবং হিংস্র প্রাণী ক্রোধের কারণে যুলুম ও নিপীড়নের দিকে আহ্বান করে। অপর দিকে শয়তান তাদের লোভ ও ক্রোধকে উত্তেজিত করতে থাকে। সে তাদের মূর্খতাকে তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করতে থাকে। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি যা প্রজ্ঞাবান সত্তার মত, তাকে শয়তানের কলাকৌশল প্রতিহত করার আদেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং সে যদি তাই করে, তবে পরিস্থিতি অনেকটা ঠিক থাকবে। দেহের রাজত্বে ন্যায়বিচার প্রকাশ পাবে এবং সবকিছু সঠিক পথে পরিচালিত হবে। পক্ষান্তরে যদি প্রজ্ঞাবান সত্তা অর্থাৎ, জ্ঞান-বুদ্ধি এদেরকে পরাভূত করতে সক্ষম না হয়, তবে এরা তাকে দাবিয়ে রাখে এবং তার কাছ থেকে খেদমত গ্রহণ করে। তখন তাকে কুকুরকে সন্তুষ্ট রাখার এবং শূকরের পেট ভরার কৌশল খুঁজতে হয়। সে সর্বক্ষণ কুকুর ও শূকরের গোলাম থেকে যায়। অধিকাংশ লোকের অবস্থা তাই। তাদের বেশীরভাগ চেষ্টা পেট ও কামনা-বাসনার সেবায় ব্যয়িত হয়। আশ্চর্যের বিষয়, তারা মূর্তিপূজারীদেরকে ঘৃণা করে এবং মূর্তিপূজার নিন্দায় সোচ্চার থাকে, কিন্তু যদি স্বয়ং তাদের অবস্থার উপর থেকে যবনিকা সরিয়ে দেয়া এবং কাশ্ফওয়ালাদের ন্যায় তাদের অবস্থাকে মূর্ত করে জাগ্রত অবস্থায় অথবা স্বপ্নে দেখানো হয়, তবে দেখা যাবে, তারা কখনও শূকরের সামনে সেজদা করেছে এবং কখনও তার আদেশ ও ইঙ্গিতের জন্যে অপেক্ষা করেছে। অথবা দেখা যাবে, তারা এক ক্ষেপা কুকুরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার এবাদত ও পূজা-অর্চনা করছে। এতে করে তারা আপন শয়তানকে সন্তুষ্ট করার জন্য সচেষ্ট থাকে। কেননা, শয়তান শূকর ও কুকুরকে মানুষের কাছ থেকে খেদমত নেয়ার জন্যে প্ররোচিত করে। ফলে তারা আসলে শূকর ও কুকুরের পূজা করে না; বরং শয়তানের আরাধনা করে। মোট কথা, মানুষ যদি তার চলাফেরা, নিশ্চলতা, কথাবার্তা, চুপ থাকা এবং উঠাবসার প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করে, তবে দেখা যাবে, সমস্ত দিন সে কেবল এসব বস্তুরই এবাদতে সচেষ্ট থাকে। এটা চূড়ান্ত পর্যায়ের অন্যায়। কেননা, এর ফলে সে মালিককে চাকর,

প্রভুকে দাস এবং প্রবলকে দুর্বল সাব্যস্ত করে। মালিক ও প্রভু হওয়ার যোগ্য ছিল জ্ঞানবুদ্ধি, যাকে মানুষ কামনারূপী শূকর, ক্রোধরূপী কুকুর ও শয়তানের অনুগত সেবাদাসে পরিণত করে দেয়। এই আনুগত্যের ফল দাঁড়ায়, তার অন্তরে বিভিন্ন মন্দ স্বভাবের মরিচা পড়তে থাকে এবং পরিণামে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কামনারূপী শূকরের আনুগত্যের ফলে যে সকল মন্দ স্বভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, সেগুলো হচ্ছে নির্লজ্জতা, দুশ্চরিত্রতা, ব্যয়বহুলতা, কৃপণতা, লোভ-লালসা, হিংসা-দ্বেষ ইত্যাদি। আর ক্রোধরূপী কুকুরের আনুগত্য থেকে উদ্ভূত মন্দ স্বভাবগুলো হচ্ছে আত্মপ্রশংসা, আত্মম্ভরিতা, অহংকার, বিদ্রূপ, অপরকে হেয় জ্ঞান করা, অনিষ্ট সাধন করা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে ক্রোধ ও কামনাপ্রীতির ফলে শয়তানের আনুগত্য থেকে উদ্ভূত মন্দ স্বভাবগুলো হচ্ছে, প্রতারণা, ধূর্তামি, ছলচাতুরী, প্রবঞ্চনা, আত্মসাৎকরণ, অশ্লীল কথন ইত্যাদি। অপরপক্ষে যদি মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি প্রবল হয় এবং কামনারূপী শূকরকে প্রতিহত করা হয়, তবে অন্তরে অনেক সদগুণ জন্মলাভ করে। যেমন– জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিশ্বাস, বস্তুনিচয়ের স্বরূপ সম্পর্কিত মারেফত, জ্ঞান-গরিমায় সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ইত্যাদি। এছাড়া এমতাবস্থায় কামনা ও ক্রোধের পূজা করতে হয় না। কামনারূপী শূকরকে প্রতিহত করলে আরও যেসকল সৎস্বভাব উৎপন্ন হয়, সেগুলো হচ্ছে, সাধুতা, অল্পে তুষ্টি, স্থিরতা, সংসারনির্লিপ্ততা, খোদাভীতি, প্রফুল্লতা, লজ্জাশীলতা ইত্যাদি। অনুরূপভাবে ক্রোধশক্তিকে নত ও পরাভূত রাখলে এবং প্রয়োজনীয় সীমায় আনয়ন করলে বীরত্ব, দয়া, আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা, স্থৈর্য, ধৈর্য, ক্ষমা, দৃঢ়তা, সাহসিকতা ইত্যাদি সৎস্বভাবের বিকাশ ঘটে। সুতরাং অন্তরকে আয়না মনে করা উচিত, যার মধ্যে এসব বিষয়ের প্রভাব একের পর এক প্রতিফলিত হতে থাকে, কিন্তু উপরোক্ত সৎস্বভাবসমূহের প্রভাবে অন্তররূপী আয়নার চমক ও জ্যোতি অধিকতর বৃদ্ধি পায়। অবশেষে তাতে আল্লাহ্র দ্যুতি বিকশিত হয় এবং প্রার্থিত ধর্মীয় বিষয়াদির স্বরূপ উদঘাটিত হয়ে যায়। এই প্রকার অন্তরের দিকে ইঙ্গিত করেই হাদীসে এরশাদ হয়েছে–

اذا اراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من قلبه –যখন আল্লাহ্ তাআলা কোন বান্দার কল্যাণ সাধন করতে চান, তখন তার জন্যে একটি উপদেশদাতা অন্তর নির্দিষ্ট করে দেন।

এরূপ অন্তরেই আল্লাহ্ তাআলার যিকির অবস্থান গ্রহণ করে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

الا بذكر الله تطمئن القلوب –শুনে রাখ, আল্লাহ্র যিকির দ্বারাই অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।

পক্ষান্তরে যে সকল নিন্দনীয় প্রভাব অন্তরের উপর ছায়াপাত করে, সেগুলো কাল ধোঁয়ার মত হয়ে থাকে। এগুলোর কারণে অন্তররূপী আয়না ক্রমশ কালবর্ণ ধারণ করতে থাকে, অবশেষে আল্লাহ্ থেকে আড়াল হয়ে যায়। কোরআন মজীদে এ অবস্থাকেই طبع ও رين অর্থাৎ, 'মোহর মারা ও 'মরিচা পড়া' বলা হয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে–

كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون –বরং তারা যা উপার্জন করত, তা তাদের অন্তরে মরিচা ধরেছে।

অন্য আয়াতে আছে–

ان لو نشاء اصبنهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لايسمعون –আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে তাদের গোনাহের কারণে পাকড়াও করব এবং তাদের অন্তরের উপর মোহর এঁটে দেব, ফলে তারা শ্রবণ করবে না।

মোটকথা, অধিক গোনাহের কারণে যখন অন্তরের উপর মোহর লেগে যায়, তখন অন্তর সত্যোপলব্ধির ব্যাপারে অন্ধ হয়ে যায়। সে আখেরাতের বিষয়াদি হালকা ও দুনিয়ার কাজ গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এবং এতেই সর্বশক্তি ব্যয় করে। সে যখন আখেরাতের অবস্থা শ্রবণ করে, তখন এক কানে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়। এই উপদেশ তার মধ্যে স্থান করে না এবং তওবার প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি করে না। এরূপ ব্যক্তিদের অবস্থা হচ্ছে–

قد يئسوا من الاخرة كما يئس الكفار من اصحب القبور

–'তারা আখেরাত থেকে নিরাশ হয়ে গেছে, যেমন কবরবাসীদের বিষয়ে কাফেররা নিরাশ হয়ে গেছে।'

কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত অন্তর কাল হওয়ার অর্থও তাই। মায়মুন ইবনে মহরান বলেন ঃ বান্দা যখন গোনাহ করে, তখন তার অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে। তওবা করলে এ দাগ মিটে যায়। এর পর পুনরায় গোনাহ্ করলে এই দাগ আরও বেড়ে যায় এবং বাড়তে বাড়তে অবশেষে সমগ্র অন্তর কাল হয়ে যায়। এরই অপর নাম মরিচা। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন–

قَلْبُ الْمُؤْمِنِ اَجْرَدُ وَفِيْهِ سِرَاجٌ يَزْهَرُ وَقَلْبُ الْكَافِرِ اَسْوَدُ مَنْكُوْسٌ

–'মুমিনের অন্তর পরিষ্কার। তাতে প্রদীপ জ্বলে। আর কাফেরের অন্তর কাল ও অধোমুখী।"

এ থেকে জানা গেল, আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্য ও কামপ্রবৃত্তির বিরোধিতা অন্তরকে ঔজ্জ্বল্য দান করে এবং আল্লাহ্র নাফরমানীর কারণে অন্তর কাল হয়ে যায়। সুতরাং যে গোনাহ করে, তার অন্তর কাল হয়ে যায়। যদি কেউ গোনাহের পরে সৎকাজ করে পূর্বের প্রভাব মিটিয়ে দিতে চায়, তবে কাল দাগ মিটে গেলেও নূরের মধ্যে কিছু ত্রুটি থেকে যায়। যেমন– আয়নায় ফুঁ মেরে পরিষ্কার করার পর আবার ফুঁ মেরে পরিষ্কার করলে কিছু না কিছু পঙ্কিলতা থেকেই যায়। নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ অন্তর চার প্রকার। (১) পরিষ্কার অন্তর। তাতে প্রদীপ জ্বলে। এটা মুমিনের অন্তর। (২) কাল অধোমুখী অন্তর। এটা কাফেরের অন্তর। (৩) গেলাফে আবৃত মুখ বাঁধা অন্তর। এটা মোনাফেকের অন্তর। (৪) এমন অন্তর, যাতে ঈমান ও নেফাক উভয়টি রয়েছে। এতে ঈমানের প্রভাব এমন, যেমন সবুজ ঘাসকে পবিত্র পানি আরও সতেজ করে তোলে। আর নেফাকের প্রভাব এমন, যেমন পুঁজ ক্ষতস্থানকে আরও বিস্তৃত করে দেয়। অতএব ঈমান ও নেফাকের মধ্যে যেটি প্রবল হবে, অন্তরের অবস্থা তদনুরূপ হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَاهُمْ مُّبْصِرُوْنَ –নিশ্চয় যারা খোদাভীরু, শয়তানের কল্পনা স্পর্শ করতেই তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তৎক্ষণাৎ চক্ষুষ্মান হয়ে যায়।

এ আয়াত ব্যক্ত করে যে, আল্লাহ্র স্মরণ দ্বারা অন্তরের ঔজ্জ্বল্য অর্জিত হয়। আর যারা খোদাভীরু, তারাই আল্লাহকে স্মরণ করে। অতএব জানা গেল, খোদাভীতি স্মরণ তথা যিকিরের ফটক, যিকির কাশফের দরজা এবং কাশফ হচ্ছে বৃহৎ নূর অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার দীদারের দ্বার।

জ্ঞানার্জনের দিক দিয়ে অন্তরের দৃষ্টান্ত

প্রকাশ থাকে যে, জ্ঞানের পাত্র হচ্ছে অন্তর। অর্থাৎ, যে সূক্ষ্ম বস্তু সমগ্র দেহের নিয়ন্ত্রণ করে এবং সমগ্র দেহ যার আনুগত্য ও সেবা করে। জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহের জন্যে এই অন্তর এমন, যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

বস্তুসমূহের জন্যে আয়না। অর্থাৎ, বস্তুসমূহের চিত্র যেমন আয়নার মধ্যে চিত্রিত হয়ে বিদ্যমান থাকে, তেমনি প্রত্যেক জানা বিষয়ের চিত্র অন্তর আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে স্পষ্টরূপ ধারণ করে। এক্ষেত্রে আয়না, বস্তুর চিত্র এবং আয়নায় তা প্রতিফলিত হওয়া যেমন ভিন্ন ভিন্ন বিষয়, তেমনি অন্তরের মধ্যেও তিনটি বস্তু ভিন্ন ভিন্ন। এক, অন্তর; দুই, বস্তুসমূহের স্বরূপ এবং তিন, স্বরূপসমূহের চিত্র জানা, যা অন্তরে উপস্থিত হয়। এর আর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, ধরার জন্যে তিনটি বিষয় জরুরী। ধারণকারী, যেমন হাত; যাকে ধারণ করা হয়, যেমন তরবারি এবং হাত ও তরবারির মিলন, যাকে ধরা বলা হয়। এমনিভাবে জানা বিষয়ের চিত্র অন্তরে পৌঁছলে তাকে এলেম তথা জ্ঞান বলা হয়। মাঝে মাঝে বস্তুর স্বরূপ বিদ্যমান থাকে এবং অন্তরও বিদ্যমান থাকে, কিন্তু জ্ঞান হয় না। কেননা, জ্ঞান বলা হয় বস্তুর স্বরূপ অন্তরে পৌঁছে যাওয়াকে। উদাহরণতঃ তরবারিও বিদ্যমান এবং হাতও উপস্থিত, কিন্তু তরবারি হাতে না পৌঁছা পর্যন্ত 'ধরা' বলা হবে না। পার্থক্য হচ্ছে, ধরার মধ্যে হুবহু তরবারি হাতে পৌঁছে যায়, কিন্তু জানা বস্তু হুবহু অন্তরে চলে যায় না; বরং তার স্বরূপ চলে যায়। উদাহরণতঃ কেউ অগ্নিকে জেনে নিলে স্বয়ং অগ্নি তার মধ্যে যাবে না; বরং বাহ্যিক আকৃতির দিক দিয়ে অগ্নির যে স্বরূপ, তা অন্তরে যায়। এদিক দিয়ে অন্তরকে আয়নার সাথে তুলনা করাই উত্তম। কেননা, আয়নার মধ্যেও স্বয়ং বস্তু চলে যায় না; বরং বস্তুর অনুরূপ একটি চিত্র প্রতিফলিত হয়।

অন্তরকে আয়নার সাথে তুলনা করার একটি বড় কারণ হল, আয়নার মধ্যে পাঁচটি কারণে চিত্র জানা যায় না। প্রথম, আয়নাই ভাল না হওয়া এবং তার মধ্যে ত্রুটি থাকা। দ্বিতীয়, আয়নার মধ্যে অন্য কোন কারণে ময়লা জমে থাকা। তৃতীয়, যে বস্তু আয়নার মধ্যে প্রতিফলিত হবে, তা সম্মুখে না থাকা কিংবা উদাহরণতঃ পেছনে থাকা। চতুর্থ, বস্তু ও আয়নার মাঝখানে আড়াল থাকা। পঞ্চম, যে বস্তুর চিত্র আয়নায় দেখতে হবে, তার সঠিক দিক জানা না থাকা। ফলে আয়না ঠিক জায়গায় রাখা যায় না। অনুরূপভাবে অন্তর আয়নার মধ্যেও সকল ক্ষেত্রে সত্য বিষয়টি উদ্ভাসিত হতে পারে, কিন্তু অন্তরে কতক জ্ঞান না আসার কারণ সেই পাঁচটি, যার কিঞ্চিত বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

প্রথম কারণ, স্বয়ং অন্তর ত্রুটিপূর্ণ হওয়া; যেমন শিশুদের অন্তর। এতে ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার কারণে জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ উদ্ভাসিত হয় না।

দ্বিতীয় কারণ, গোনাহ ও নাফরমানীর ময়লা, যা অধিক কামলিপ্সার

কারণে অন্তরের উপর এসে জমা হয় এবং তার ঔজ্জ্বল্য ও স্বচ্ছতা বিনষ্ট করে দেয়। এই কালিমার কারণে অন্তরে সত্য বিষয়টি ফুটে উঠতে পারে না। এদিকে ইঙ্গিত করেই হাদীসে বলা হয়েছে, যেব্যক্তি কোন গোনাহ্ করে, বিবেক-বুদ্ধি তার কাছ থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং কখনও তার কাছে ফিরে আসে না। অর্থাৎ, তার অন্তরে এমন কালিমা পড়ে যায়, যার প্রভাব কখনও দূরীভূত হয় না। কেননা, গোনাহের পরে পুণ্য কাজ করলেও তার কারণে সেই প্রভাব দূর হবে না, কিন্তু সে যদি গোনাহ্ না করত এবং পুণ্য কাজই করত, তবে নিঃসন্দেহে অন্তরে নূর বৃদ্ধি পেত। প্রথমে গোনাহ করার কারণে পুণ্য কাজের তেমন উপকার হয়নি। বরং গোনাহের পূর্বে অন্তর যেমন ছিল, তেমনি রয়ে গেল– নূর বৃদ্ধি পেল না। বাস্তবে এটা এমন ভয়ংকর ক্ষতি, যার কোন প্রতিকার নেই। দেখ, যে আয়নায় একবার মরিচা পড়ে যায়, এর পর তা ঘষে-মেজে পরিষ্কার করা হয়, তা সেই আয়নার সমান হয় না, যা মরিচা ছাড়াই পরিষ্কার রাখা হয়। মোট কথা, আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের দিকে ধাবিত হওয়া এবং কামলিপ্সা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া আন্তরিক স্বচ্ছতার কারণ হয়ে থাকে।

এ জন্যেই আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন ঃ

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا –'যারা আমাকে পাওয়ার জন্যে অধ্যবসায় করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথ প্রদর্শন করব।'

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثَهُ اللّٰهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ –'যে ব্যক্তি তার জানা বিষয়ে আমল করে, আল্লাহ তাকে অজানা বিষয়ের এলেম দান করেন।'

তৃতীয় কারণ, প্রার্থিত স্বরূপের প্রতি বিমুখ হওয়া। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি আনুগত্যশীল ও সৎকর্মপরায়ণ, কিন্তু তার অন্তর সত্যান্বেষী নয়। বরং অধিকাংশ শারীরিক এবাদত কিংবা জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রে আপন প্রচেষ্টা ব্যাপৃত রাখে। এরূপ ব্যক্তির অন্তর যদিও স্বচ্ছ হয়ে থাকে, কিন্তু তাতে সত্যের দ্যুতি বিদ্যমান থাকে না। এতে সেই বিষয়ই উদঘাটিত হয়, যার কল্পনায় সে মগ্ন থাকে। অতএব যেব্যক্তি আপন প্রচেষ্টাকে জাগতিক কামলিপ্সা ও তার আনন্দে ব্যাপৃত রাখে, তার সামনে সত্য বিষয় কিরূপে উদঘাটিত হতে পারে?

চতুর্থ কারণ "হিজাব" তথা আড়াল থাকা। উদাহরণতঃ কোন আনুগত্যশীল ব্যক্তি তার কামলিপ্সা দাবিয়ে রেখেছে। সে কোন সত্য উদঘাটনের জন্য চিন্তা-ভাবনা করলে মাঝে মাঝে তার সামনে সত্য উদঘাটিত হয় না। কেননা, সে পৈতৃক অনুকরণ কিংবা সুধারণার কারণে কোন একটি বিশ্বাস মনে পোষণ করে নেয়। এ বিশ্বাসটিই সত্য বিষয়ের মধ্যে ও তার অন্তরের মধ্যে আড়াল হয়ে যায়। সে শৈশবকাল থেকে যে বিশ্বাস নিয়ে বড় হয়, সেই বিশ্বাস অন্তরে কোন বিপরীত বিশ্বাস উদঘাটিত হওয়ার পথে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এটা নিঃসন্দেহে একটি বড় অন্তরায়, যার কারণে অধিকাংশ মুসলিম দার্শনিক ও বিভিন্ন মতের বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তিবর্গ সত্যের আড়ালে রয়ে গেছেন। বরং অধিকাংশ সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি, যাদের চিন্তা-ভাবনা যমীন ও আকাশের রাজ্যে বিচরণ করে, তারাও এই বালায় গ্রেফতার আছেন।

পঞ্চম কারণ, প্রার্থিত সত্যের দিক সম্পর্কে অজ্ঞতা। উদাহরণতঃ কোন বিদ্যার্থী যদি কোন অজানাকে জানতে চায়, তবে যে পর্যন্ত জানা তথ্যসমূহকে জ্ঞানীদের কাছে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে বিন্যস্ত না করবে, সেই পর্যন্ত প্রার্থিত ফল অর্জিত হবে না। কেননা, যেসকল জ্ঞান মজ্জাগত নয়, সেগুলো অন্যান্য জানা তথ্যসমূহের সাহায্য ব্যতিরেকে অর্জিত হতে পারে না। যেমন– নর ও মাদী ব্যতীত বাচ্চা আসতে পারে না। কেউ যদি ঘোটক শাবক লাভ করতে চায়, তবে তা উট ও গাধা থেকে অর্জিত হবে না; বরং এর জন্যে ঘোটক-ঘোটকী দরকার। অনুরূপভাবে প্রত্যেক জ্ঞানের জন্যে দু'টি বিশেষ মূল ও একটি বিন্যাস পদ্ধতি প্রয়োজন। এতে প্রার্থিত জ্ঞান অর্জিত হবে। সুতরাং এসব মূল বিষয় ও বিন্যাস পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতা সত্যোপলব্ধির ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে থাকে; যেমন আয়নায় সঠিক দিক না জানার কারণে চিত্র প্রতিফলিত হয় না। এ বিষয়ের একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত হল, কোন ব্যক্তি যদি আয়নায় তার পৃষ্ঠদেশ দেখতে চায়, তবে আয়না মুখের সামনে রাখলে পৃষ্ঠদেশ দেখা যাবে না। কেননা, আয়না পিঠের বিপরীতে নয়। আয়না পিঠের বিপরীতে রাখলেও পিঠ দৃষ্টিগোচর হবে না; বরং স্বয়ং আয়নাও দেখা যাবে না। কেননা, আয়না তার দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় পিঠ দেখতে হলে আরও একটি আয়নার প্রয়োজন হবে। একটি পিঠের বিপরীতে রাখবে এবং অপরটি চোখের সামনে এমনভাবে রাখবে যে, উভয় আয়না একটি অপরটির বিপরীতে থাকে। এমতাবস্থায় এই ব্যক্তি নিজের পৃষ্ঠদেশ দেখতে পারে। কেননা, তার পিঠের প্রতিচ্ছবি পেছনের আয়নায় পড়বে

এবং তার প্রতিচ্ছবি সামনে রক্ষিত অপর আয়নায় পড়বে। এমনিভাবে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টান্তের চেয়েও অধিক বিচিত্র ধরনের কর্মকাণ্ডের আশ্রয় নিতে হয়। ভূপৃষ্ঠে এমন কেউ নেই, যার এসব কর্মকাণ্ড আপনা আপনি জানা হয়ে যায়। এটাই অন্তরের জন্যে সত্যোপলব্ধিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রত্যেক অন্তরেরই মজ্জাগতভাবে সত্য অনুধাবনের যোগ্যতা নেই। কেননা, এ যোগ্যতা একটি খোদায়ী বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই অন্তরাত্মা সকল সৃষ্টি থেকে ভিন্ন ও সেরা। আল্লাহ্ তাআলা কোরআন পাকে এ বিষয়টিই এরশাদ করেছেন–

إِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ

–'আমি আমানতটি পেশ করেছি আকাশমণ্ডলীর সামনে, পৃথিবীর সামনে এবং পর্বতমালার সামনে। অতঃপর কেউ তা বহন করতে স্বীকৃত হল না। তারা ভীত হয়ে গেল, কিন্তু মানুষ তা বহন করেছে।'

অর্থাৎ, মানুষ একটি বৈশিষ্ট্যের কারণে আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও পর্বতমালা থেকে স্বাতন্ত্র্য লাভ করছে এবং খোদায়ী আমানত বহন করার যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে। এই আমানত হচ্ছে অধ্যাত্ম জ্ঞান তথা মারেফত ও তাওহীদ। প্রত্যেক মানুষের অন্তর এই আমানত বহন করার যোগ্য, কিন্তু আমরা যেসকল কারণ বর্ণনা করেছি সেগুলোর ফলস্বরূপ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। এ জন্যেই নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেন-

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاِنَّمَا اَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ

–প্রত্যেক নবজাত শিশু 'ফিতরত" তথা মূল ইসলামের উপর জন্মগ্রহণ করে। এর পর তার পিতামাতা তাকে ইহুদী এবং খৃষ্টান বানিয়ে দেয়।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ لَوْ لَا اَنَّ الشَّيَاطِيْنَ يَحُوْمُوْنَ عَلٰى قُلُوْبِ بَنِىْ اٰدَمَ لَنَظَرُوْا اِلٰى مَلَكُوْتِ السَّمَاءِ –'যদি আদম সন্তানের অন্তরের চারপাশে শয়তানরা ঘুরাফেরা না করত, তবে সে আকাশের ফেরেশতা ও রহস্যাবলী অবলোকন করত।' এতে কতক কারণ বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো অন্তর ও উর্ধ্ব জগতের মধ্যে আড়াল হয়ে থাকে। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই উক্তির মধ্যেও এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। একবার লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা কোথায় আছেন– পৃথিবীতে, না

আকাশে? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ ঈমানদার বান্দাদের অন্তরে আছেন। এক হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে– পৃথিবীতে আমার সংকুলান হয় না– আকাশেও না। আমার সংকুলান আমার মুমিন বান্দার অন্তরে হয়, যে অন্তর নরম ও স্থির। এ কারণেই হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ আমার অন্তর আল্লাহকে যখন দেখেছে, তখনই তাকওয়ার কারণে নূর আড়াল হয়ে গেছে। যার সামনে থেকে আড়াল দূর হয়ে যায়, তার অন্তরে ঊর্ধ্ব জগতের চিত্র ফুটে উঠে। সকল এবাদত ও দৈহিক ক্রিয়াকর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্তর পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হওয়া। আর স্বচ্ছতার লক্ষ্য হচ্ছে অন্তরে খোদায়ী মারেফতের দ্যুতি এসে যাওয়া। মারেফতের এই দ্যুতিই নিম্নোক্ত আয়াতে বুঝানো হয়েছে ঃ

أَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ– আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের জন্যে যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেন, সে তার পরওয়ারদেগারের পক্ষ হতে একটি নূরের উপর থাকে। বলাবাহুল্য, এই দ্যুতি ও ঈমানের তিনটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর সর্বসাধারণের ঈমান। নিছক অনুকরণের উপর এর ভিত্তি। দ্বিতীয় স্তর দার্শনিকদের ঈমান। এতে কিছু যুক্তি প্রমাণও থাকে, কিন্তু এটাও সর্বসাধারণের ঈমানের কাছাকাছি। তৃতীয় স্তর আরেফ তথা বিভুজ্ঞানীদের ঈমান, যা একীনের নূর থেকে অর্জিত হয়। আমরা এ তিনটি স্তরকে একটি উদাহরণ দ্বারা বর্ণনা করছি। উদাহরণতঃ যায়েদ গৃহে আছে– এ কথা তিনভাবে জানা যায়। প্রথমতঃ কোন সত্যবাদী ব্যক্তির বর্ণনা, যার সত্যবাদিতা বার বার পরীক্ষিত হয়েছে এবং যার কথায় মিথ্যার অবকাশ নেই। এরূপ ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস করা যাবে যে, যায়েদ নিঃসন্দেহে গৃহে আছে। এটা নিছক অনুকরণমূলক ঈমানের দৃষ্টান্ত। সাধারণ মানুষের অবস্থা তাই। তারা জ্ঞানবুদ্ধির বয়সে পৌঁছে পিতামাতার কাছে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব, জ্ঞান, কুদরত, ইচ্ছা ইত্যাদি সকল সেফাত, পয়গম্বরগণের আগমন এবং তাঁদের আনীত বিধি-বিধান সত্য হওয়ার কথা শুনে এবং তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস স্থাপন করে। অতঃপর আজীবন এর উপরই কায়েম থাকে। এর বিরুদ্ধে অন্তরে কোন কল্পনা আসে না। কেননা, পিতামাতা ও গুরুজনদের প্রতি তারা সুধারণা পোষণ করে। এ ধরনের ঈমান পারলৌকিক মুক্তির কারণ হয়ে থাকে। এরূপ মুমিন ব্যক্তি কোরআনে বর্ণিত "আসহাবে ইয়ামীনের" সর্বনিম্ন স্তর। সে "মোকাররাব" তথা নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, নৈকট্যশীল হওয়ার জন্যে কাশ্ফ এবং বক্ষ একীনের আলোকে আলোকিত হওয়া জরুরী, যা এ ধরনের ঈমানে অনুপস্থিত। এছাড়া এ'তেকাদ তথা

বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কতক লোক কিংবা অনেক লোকের বর্ণিত খবরে ভ্রান্তিরও সম্ভাবনা থাকে। ইহুদী ও খৃষ্টানদের অন্তরও তাদের পিতামাতার কথায় প্রশান্ত হয়, কিন্তু তারা যেসব আকীদা পোষণ করে, সেগুলো ভ্রান্ত। কেননা, তাদের অন্তরে ভ্রান্তিই নিক্ষিপ্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের আকীদা সত্য।'

দ্বিতীয়, প্রাচীরের আড়ালে দাঁড়িয়ে গৃহের ভিতর থেকে যায়েদের শব্দ শ্রবণ করা। এর মাধ্যমেও জানা যায় যে, যায়েদ গৃহে আছে। অপরের কাছে শুনে যে পরিমাণ বিশ্বাস হয়, নিজ কানে শব্দ শুনে তার চেয়ে বেশী বিশ্বাস হবে। কেননা, আওয়াজ শুনলে যার আওয়াজ, তার সমস্ত আকার-আকৃতি চিন্তায় উপস্থিত হয়ে যায় এবং অন্তরে বদ্ধমূল হয়, এই আওয়াজ অমুকের। এটা দ্বিতীয় প্রকার ঈমানের দৃষ্টান্ত, যার মধ্যে কিছু প্রমাণেরও মিশ্রণ আছে, কিন্তু ভ্রান্তির সম্ভাবনা এর মধ্যেও রয়েছে। কেননা, একজনের কণ্ঠস্বর অন্যজনের সাথে মিলেও যেতে পারে। কেউ কেউ আবার অন্যের কণ্ঠস্বর হুবহু নকল করতে পারে।

তৃতীয়, তুমি নিজে গৃহের ভিতরে গিয়ে যায়েদকে দেখে নেবে যে, সে গৃহে উপস্থিত আছে। এটা বিভুজ্ঞানী নৈকট্যশীল ও সিদ্দীকগণের ঈমান। একেই মারেফত ও মুশাহাদা বলা হয়। কারণ, তাদের ঈমান মুশাহাদা তথা প্রত্যক্ষকরণের পরে হয়ে থাকে। তবে এর মধ্যে সর্বসাধারণ ও দার্শনিকের ঈমানও শামিল এবং তাতে কেবল প্রত্যক্ষকরণের স্তরটি অতিরিক্ত, সে কারণে ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে না। হাঁ, এর মধ্যে কাশফ ও জ্ঞানের পরিমাণে তফাৎ হয়। জ্ঞানের পরিমাণে তফাৎ এমন, যেন কোন ব্যক্তি গৃহের আঙ্গিনায় গিয়ে যায়েদকে খুব আলোর মধ্যে দেখে এবং অন্য ব্যক্তি কোন কক্ষে অথবা রাতের বেলায় দেখে। এখানে প্রথম ব্যক্তির দেখা অধিক কামেল হবে। এমনিভাবে প্রত্যক্ষকরণের ক্ষেত্রে কেউ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়গুলোও দেখে জেনে নেয় এবং কেউ এ থেকে বঞ্চিত থাকে। জ্ঞানার্জনের দিক দিয়ে এ হচ্ছে অন্তরের অবস্থা।

যৌক্তিক, ধর্মীয়, জাগতিক ও পারলৌকিক জ্ঞানে অন্তরের অবস্থা

পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, অন্তর স্বভাবগতভাবে জ্ঞাতব্য বিষয়াদি গ্রহণে তৎপর। এখন বলা হচ্ছে, যেসব জ্ঞান অন্তরে আসে, সেগুলো দু'প্রকার– যুক্তিগত ও শরীয়তগত। যুক্তিগত জ্ঞানও দু'প্রকার– এক, যা শিক্ষালব্ধ

নয় এবং দুই, যা শিক্ষালব্ধ। যে জ্ঞান শিক্ষালব্ধ তাও দু'প্রকার– জাগতিক ও পারলৌকিক। যুক্তিগত জ্ঞান বলে আমাদের উদ্দেশ্য এমন জ্ঞান, যার কারণ নিছক যুক্তি– অনুকরণ ও শ্রবণ নয়। এর মধ্যে সেই জ্ঞান শিক্ষালব্ধ নয়, যাতে জানা যায় না যে, এই জ্ঞান কোথা থেকে এবং কিভাবে অর্জিত হয়েছে? উদাহরণতঃ এটা জানা যে, এক ব্যক্তি একই সময় দুটি গৃহে থাকতে পারে না এবং একই বস্তু নশ্বর, অবিনশ্বর কিংবা উপস্থিত ও অনুপস্থিত একই সাথে হতে পারে না। এ জ্ঞান মানুষ শৈশবকাল থেকে অর্জন করে, কিন্তু সে জানে না, দু'গৃহে থাকা এটা কখন এবং কিভাবে অর্জিত হয়েছে? অর্থাৎ, এর কোন বাহ্যিক ও নিকটবর্তী কারণ জানে না। নতুবা আল্লাহর পক্ষ থেকে যে এসেছে, এটা জানে। আর শিক্ষালব্ধ জ্ঞান হচ্ছে, যাতে শিক্ষা ও প্রমাণ করার প্রয়োজন আছে। এই উভয় প্রকারকে 'আকল' বলা হয়। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ আকল দু'প্রকার– স্বভাবগত ও শ্রবণগত। স্বভাবগত আকল ব্যতীত শ্রবণগত আকলের কোন ফায়দা নেই; যেমন সূর্যকিরণ দ্বারা অন্ধের কোন উপকার হয় না।

রসূলে করীম (সাঃ) এক হাদীসে বলেন ঃ

مَا خَلَقَ اللّٰهُ خَلْقًا اَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَقْلِ –আল্লাহ তাআলা আকল অপেক্ষা অধিক মহৎ কোন কিছু সৃষ্টি করেননি।

এখানে প্রথম প্রকার আকল বুঝানো হয়েছে।

অন্য এক হাদীসে তিনি বলেন ঃ

اِذَا تَقَرَّبَ النَّاسُ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى بِاَنْوَاعِ الْبِرِّ فَتَقَرَّبْ اَنْتَ بِعَقْلِكَ –'যখন মানুষ নানা প্রকার পুণ্য কাজ দ্বারা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করে, তখন তুমি আপন আকল দ্বারা নৈকট্য লাভ কর।'

এখানে দ্বিতীয় প্রকার আকল বুঝানো হয়েছে। কেননা, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্যে শিক্ষালব্ধ জ্ঞান দরকার। মোট কথা, অন্তরকে মনে করতে হবে চক্ষু এবং স্বভাবগত আকলকে বুঝতে হবে দৃষ্টিশক্তিরূপে। দৃষ্টিশক্তি অন্ধের মধ্যে থাকে না, চক্ষুষ্মান ব্যক্তির মধ্যে থাকে, যদিও সে তার চক্ষু বন্ধ করে নেয় অথবা অন্ধকার রাত্রে থাকে। যে কলম দ্বারা আল্লাহ তাআলার জানা বিষয় অন্তরে মুদ্রিত করে, তাকে সূর্যের গোল পরিমণ্ডল মনে করা উচিত। শৈশবে জ্ঞান অর্জিত না হওয়ার কারণ এটাই যে, তখন পর্যন্ত মানসপটে জ্ঞান চিত্রিত করার যোগ্যতা থাকে না। "কলম" বলে আমাদের উদ্দেশ্য আল্লাহর সৃজিত এমন একটি বস্তু, যদ্দারা

অন্তরে জ্ঞানের চিত্র আঁকা হয়ে যায়।

আল্লাহ বলেন ঃ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ –তিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন।

মানুষকে এমন বিষয় শিখিয়েছেন, যা সে জানত না।

আল্লাহ তাআলার কলম আমাদের কলমের মত নয়। যেমন– তাঁর গুণাবলী সৃষ্টির গুণাবলী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

মোট কথা, অন্তশ্চক্ষু ও চর্মচক্ষুর মধ্যে উপরোক্ত বিষয়সমূহে মিল আছে, কিন্তু সম্মান ও মর্যাদায় কোন মিল নেই। এ মিলের কারণেই আল্লাহ তাআলা অন্তরের উপলব্ধিকে দেখা বলে ব্যক্ত করে বলেছেন ঃ

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى –অন্তর যা দেখেছে, তা মিথ্যা দেখেনি।

আরও বলা হয়েছে ঃ

كَذٰلِكَ نُرِىْ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ –এমনিভাবে আমি ইবরাহীমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব দেখাতে থাকি।

এ আয়াতে আত্মোপলব্ধিকে দেখা বলে প্রকাশ করা হয়েছে। এমনিভাবে নিম্নের আয়াতসমূহে উপলব্ধির বিপরীত বিষয়কে অন্ধত্ব বলা হয়েছে ঃ فَاِنَّهَا لَاتَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِىْ فِى الصُّدُوْرِ –নিশ্চয় চক্ষু অন্ধ হয় না। তবে বক্ষস্থিত অন্তর অন্ধ হয়। مَنْ كَانَ فِىْ هٰذِهٖ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى –যে এ জগতে অন্ধ থাকে, সে পরকালেও অন্ধ থাকবে। এ পর্যন্ত যৌক্তিক জ্ঞানের কথা বর্ণিত হল। এক্ষণে ধর্মীয় জ্ঞানের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে।

ধর্মীয় জ্ঞান পয়গম্বরগণের অনুসরণ তথা আল্লাহর কিতাব ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীস শিক্ষা করার মাধ্যমে অর্জিত হয়। এর মাধ্যমেই অন্তরগত গুণাবলী পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করে এবং অন্তরগত রোগ-ব্যাধি ও ব্যথার উপশম ঘটে। যৌক্তিক জ্ঞানের প্রয়োজন থাকলেও সেটা অন্তরের নিরাপত্তার জন্যে যথেষ্ট নয়। কেননা, কোরআন ও হাদীসের বিষয়সমূহ আপনা আপনি আকল তথা যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা জানা যায় না, কিন্তু শ্রবণের পর যথাযথ বুঝার জন্যে আকলের প্রয়োজন হয়। এ থেকে প্রমাণিত হল, শ্রবণ ছাড়া আকলের উপায় নেই এবং আকল থেকে শ্রবণের পলায়নের পথ নেই। যেব্যক্তি কেবল তাকলীদ তথা

অনুসরণই করে যায় এবং আকলকে শিকায় তুলে রাখে, সে মূর্খ। অনুরূপভাবে যে কেবল আকলকেই যথেষ্ট মনে করে এবং কোরআন ও হাদীসের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না, সে উদ্ধত। অতএব উভয়বিধ জ্ঞান অর্জন করা উচিত। কেননা, যৌক্তিক জ্ঞান খাদ্যের মত এবং শরীয়তের জ্ঞান ওষুধের অনুরূপ। রুগ্ন ব্যক্তি যদি ওষুধ না খায়, তবে কেবল খাদ্য খেয়ে তার রোগ দূর হবে না। এমনিভাবে অন্তরের রোগসমূহের চিকিৎসা সেসব ভেষজ দ্বারা হতে পারে, যা শরীয়তের হাসপাতালে পাওয়া যায়। অর্থাৎ, ওযীফা, এবাদত ও সৎকর্ম। সুতরাং যেব্যক্তি তার রোগাক্রান্ত অন্তরের চিকিৎসা এবাদত দ্বারা করবে না সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেমন– সেই রুগীর ক্ষতি হয়, যে ওষুধ না খেয়ে কেবল খাদ্য খেতে থাকে।

যারা বলে, যৌক্তিক জ্ঞান শরীয়তের জ্ঞানের বিপরীত, কাজেই উভয়বিধ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভবপর নয়, তারা অজ্ঞতার কারণে এ কথা বলে। তারা অন্তশ্চক্ষুর নূর থেকে বঞ্চিত। বরং তাদের দৃষ্টিতে শরীয়তের কতক জ্ঞানও পরস্পর বিরোধী প্রতিভাত হয়ে থাকে। তারা এগুলোর সমন্বয় সাধনে ব্যর্থ হয়ে ধারণা করতে থাকে যে, শরীয়তই ত্রুটিপূর্ণ। অথচ এরূপ মনে হওয়ার কারণ হচ্ছে তাদের নিজেদের অক্ষমতা। উদাহরণতঃ জনৈক অন্ধ ব্যক্তি কারও গৃহে প্রবেশ করার পর ঘটনাক্রমে বাসনকোসনের উপর তার পা পড়ে গেল। এতে সে বলতে লাগল ঃ এ গৃহের লোকেরা কেমন যে, পথের মধ্যে বাসনকোসন রেখে দেয়। এগুলো যথাস্থানে রাখল না কেন? জওয়াবে গৃহের লোকেরা বলল ঃ মিয়া সাহেব, বাসনকোসন তো যথাস্থানেই রাখা আছে, কিন্তু অন্ধত্বের কারণে আপনিই পথের দিশা পাননি। আশ্চর্যের বিষয়, আপনি নিজের ত্রুটি দেখলেন না, অপরের দোষ ধরতে শুরু করেছেন!

হাঁ, যৌক্তিক জ্ঞান ও শরীয়তের জ্ঞান এদিক দিয়ে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী, কেউ এগুলোর কোন একটিতে সর্বপ্রযত্নে মনোনিবেশ করলে অপরটি থেকে সে প্রায়শ গাফেল থেকে যায়। এ কারণেই হযরত আলী (রাঃ) দুনিয়া ও আখেরাতের তিনটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। এক উক্তিতে তিনি বলেন, দুনিয়া ও আখেরাত নিক্তির দু'পাল্লার মত। দ্বিতীয় উক্তি হচ্ছে, উভয়টি পূর্ব ও পশ্চিমের মত। তৃতীয় উক্তিতে বলেছেন– এরা দু'সতীনের মত। একটি রাজি হলে অপরটি নারাজ হয়ে যায়। এ কারণেই দেখা যায়, যারা দুনিয়ার বিষয়াদিতে খুব চালাক-চতুর হয়, তারা আখেরাতের ব্যাপারাদিতে মূর্খ থেকে যায়। পক্ষান্তরে যারা আখেরাতের সূক্ষ্ম বিষয়াদি সম্পর্কে পারদর্শী হয়, তারা প্রায়ই দুনিয়ার জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ হয়। কেননা, অধিকাংশ লোকের আকল-শক্তি উভয়

বিষয় অর্জনে সক্ষম হয় না। একটি শিখলে অপরটিতে পূর্ণতা অর্জন করতে পারে না। এ কারণেই হাদীসে বলা হয়েছে– অধিকাংশ জান্নাতী আত্মভোলা। অর্থাৎ দুনিয়ার বিষয় সম্পর্কে অচেতন। হযরত হাসান বসরী এক ওয়ায়ে বলেন ঃ আমি এমন লোকদের সাক্ষাৎ লাভ করেছি, যাদেরকে তোমরা দেখলে পাগল বলতে এবং তারা তোমাদেরকে দেখলে শয়তান বলত। অতএব, কোন অভিনব ধর্মীয় বিষয়কে যদি যাহেরী আলেমগণ অস্বীকার করে, তবে তাদের ব্যাপারে সন্দেহ করা উচিত নয়; বরং বুঝা দরকার যে, কেউ পূর্ব দিকে গমন করে যেমন পশ্চিমের বস্তু পেতে পারে না, তাদের অস্বীকারও তেমনি। দুনিয়া ও আখেরাতের বিষয়ও এই পর্যায়ে পড়ে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ .

–নিশ্চয় যারা আমার সাক্ষাৎ আশা করে না, পার্থিব জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে এবং তা দ্বারাই প্রশান্তি লাভ করে এবং যারা আমার নিদর্শনাবলী থেকে গাফেল।

আরও বলা হয়েছে–

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ .

–তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিকটা জানে এবং তারা আখেরাতের খবর রাখে না।

অন্য এক আয়াতে আছে–

فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَوٰةَ الدُّنْيَا ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ .

–অতএব সেই ব্যক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন, যে আমার যিকিরের প্রতি বিমুখ হয়ে পার্থিব জীবনই কামনা করে। তাদের বিদ্যার দৌড় এ পর্যন্তই।

মোট কথা, আল্লাহ তাআলা আপন কৃপায় যাদেরকে উভয় জাহানের জ্ঞান দান করেন, তারাই কেবল দুনিয়া ও আখেরাত সম্পর্কে পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে পারেন এবং তারা হলেন আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম। তাদের অন্তরে সকল বিষয়ের সংকুলান হয়ে থাকে।

এলহামের ক্ষেত্র সুফী ও আলেমের পার্থক্য

জানা উচিত, যে জ্ঞান শিক্ষালব্ধ নয়; বরং কখনও কখনও অন্তরে জাগরিত হয়ে যায়, তাকে এলহাম বলা হয়। এই জ্ঞান কয়েক প্রকারে অন্তরে জাগরিত হয়। কখনও মনে হয়, কেউ অজ্ঞাতে অন্তরে ঢেলে দিয়েছে এবং কখনও শিক্ষার পদ্ধতিতে অর্জিত হয়। প্রথম প্রকারকে 'নফখ ফিল কলব' এবং দ্বিতীয় প্রকারকে 'এতেবার' ও 'এস্তেবসার' আখ্যা দেয়া হয়। এলহাম কখনও এমনভাবে হয় যে, বান্দা বুঝতেও পারে না, এই জ্ঞান কোথা থেকে কিভাবে অর্জিত হল। এটা আলেম ও সুফীগণের জন্যে হয়। আবার কখনও জ্ঞান লাভের পন্থা পদ্ধতি বান্দার জানা হয়ে যায়। অর্থাৎ যে ফেরেশতা অন্তরে জ্ঞান ঢেলে দেয়, সে বান্দার দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। এই প্রকার এলহামকে ওহী বলা হয়। এটা পয়গম্বরগণের বৈশিষ্ট্য। যে জ্ঞান উপার্জন ও প্রমাণের মাধ্যমে হাসিল হয়, তা আলেমগণের জ্ঞান।

সত্য হচ্ছে, সকল বিষয়ের মধ্যে সত্যকে জেনে নেয়ার যোগ্যতা অন্তরের রয়েছে, কিন্তু পূর্বোল্লিখিত পাঁচটি কারণই এতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই পাঁচটি কারণ যেন অন্তররূপী আয়না ও লওহে মাহফুযের মধ্যে আড়াল হয়ে যায়। লওহে মাহফুয এমন একটি সংরক্ষিত ফলক, যাতে কেয়ামত পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য সকল বিষয় চিত্রিত আছে। এই ফলক থেকে অন্তরের উপর জ্ঞান প্রতিফলিত হওয়া এমন, যেমন এক আয়নার প্রতিচ্ছবি অন্য আয়নায় দৃষ্টিগোচর হয়। উভয় আয়নার মধ্যবর্তী আড়াল যেমন কখনও হাতে সরিয়ে দেয়া হয় এবং কখনও আপনা-আপনি বাতাসের চাপে সরে যায়, তেমনি মাঝে মাঝে খোদায়ী কৃপার সমীরণ প্রবাহিত হয় এবং অন্তশ্চক্ষুর সামনে থেকে পর্দা সরে যায়। ফলে লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ কতক বিষয় দৃষ্টিগোচর হয়। এটা কখনও স্বপ্নে হয়। এতে ভবিষ্যতের অবস্থা জানা হয়ে যায়। সম্পূর্ণ পর্দা সরে যাওয়া মৃত্যুর পরই সম্ভবপর। মাঝে মাঝে জাগ্রত অবস্থায়ও পর্দা সরে যায় এবং সাথে সাথে অদৃশ্য যবনিকার অন্তরাল থেকে বিস্ময়কর জ্ঞানের বিষয়াদি অন্তরে উন্মোচিত হয়ে যায়। এই উন্মোচন ক্ষণস্থায়ী হয়ে থাকে এবং এর স্থায়িত্ব খুবই বিরল। সারকথা, অন্তরে জ্ঞান এলহাম হওয়া ও জ্ঞানার্জন করা– এতদুভয়ের মধ্যে কেবল পর্দা সরে যাওয়ার পার্থক্য আছে। এছাড়া পাত্র ও কারণের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। পর্দা সরে যাওয়াটা বান্দার এখতিয়ারে নেই। এমনিভাবে ওহী ও এলহামের মধ্যে এছাড়া কোন তফাৎ নেই যে,

ওহীর মধ্যে জ্ঞানের মাধ্যম অর্থাৎ, ফেরেশতা দৃষ্টিগোচর হয় এবং এলহামে দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু অর্জিত হয় ফেরেশতার মাধ্যমেই। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَاءُ ـ

অর্থাৎ, কোন মানুষের সাধ্য নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন, কিন্তু ওহীর মাধ্যমে অথবা পর্দার আড়াল থেকে অথবা কোন বার্তাবাহক প্রেরণের মাধ্যমে, যে তাঁর নির্দেশে তিনি যা চান পেঁছে দেবে।

এখন জানা উচিত, সুফী সম্প্রদায় এলহামী জ্ঞানের প্রতি উৎসাহী হয়ে থাকেন– শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের প্রতি নয়। এ কারণেই তারা গ্রন্থকারদের লেখা গ্রন্থসমূহ পাঠ করেন না এবং উক্তি ও প্রমাণাদি নিয়ে আলোচনা করেন না। তারা বলেন ঃ প্রথমে খুব সাধনা করা উচিত এবং কুস্বভাব ও যাবতীয় সাংসারিক সম্পর্ক ছিন্ন করে কায়মনোবাক্যে সর্বপ্রযত্নে আল্লাহ তাআলার দিকে মনোনিবেশ করা দরকার। এটা অর্জিত হয়ে গেলে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং বান্দার অন্তরের কার্যনির্বাহী ও যিম্মাদার হয়ে যাবেন। তিনি যিম্মাদার হয়ে গেলে বান্দার প্রতি রহমত ছায়াপাত করবে এবং অন্তরে নূর চমকাতে থাকবে। ফলে ঊর্ধ্ব জগতের রহস্য তার সামনে উন্মোচিত হয়ে যাবে। অন্তরের সামনে থেকে আড়াল দূর হয়ে যাবে এবং খোদায়ী বিষয়াদির সত্যাসত্য উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেবে। এ বক্তব্য অনুযায়ী বান্দার কাজ এতটুকু যে, সে কেবল আত্মশুদ্ধি করবে এবং খাঁটি ইচ্ছা সহকারে খোদায়ী রহমতে জ্ঞানোন্মেষের জন্যে অপেক্ষমাণ ও পিপাসার্ত থাকবে। এভাবে পয়গম্বর ও ওলীগণের সামনে সত্য উদঘাটিত হয়ে অন্তর নূরানী হয়ে যায়। এটা লেখাপড়া ও গ্রন্থ পাঠ দ্বারা হয় না। কারণ, যে আল্লাহর হয়ে যায়, আল্লাহ তার হয়ে যান।

যাহেরী আলেমগণ জ্ঞানলাভের উপরোক্ত পদ্ধতি অস্বীকার করেন না। তারা স্বীকার করেন যে, বিরল হলেও এভাবে মনযিলে মকসুদ পর্যন্ত পৌঁছা যায়। কেননা, অধিকাংশ নবী ও ওলীর অবস্থা তাই হয়, কিন্তু তাঁরা বলেন, এ পদ্ধতি অত্যন্ত কঠিন এবং এর ফলাফল বিলম্বে পাওয়া যায়। এর জন্যে যে সকল শর্ত রয়েছে, সেগুলো অর্জন করাও খুবই দুরূহ ব্যাপার। কেননা, যাবতীয় সম্পর্ক এমনভাবে ছিন্ন করা এক রকম অসম্ভব। যদি ছিন্ন হয়েও যায়, তবে তা অব্যাহত থাকা আরও বেশী কঠিন। কেননা, সামান্য কুমন্ত্রণা ও শংকার কারণে অন্তর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন–

قَلْبُ الْمُؤْمِنِ اَشَدُّ تَقَلُّبًا مِنَ الْقِدْرِ فِيْ غَلَيَانِهَا ۔

–মুমিনের অন্তর ফুটন্ত পানির চেয়েও অধিক স্ফুটিত হতে থাকে।

এছাড়া এই সাধনায় কখনও মেযাজ বিগড়ে যায়, মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে এবং স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়। পূর্ব থেকে জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে মনকে সুসংযত করে না নিলে অন্তরে নানাবিধ ক্ষতিকর চিন্তা এসে ভিড় জমায়। এগুলো দূর না করা পর্যন্ত মন এগুলোতেই লিপ্ত থাকে, অথচ সারা জীবনেও এগুলোর সমাধান হয় না। এ পথে চলেছেন, এমন অনেক সুফী একই চিন্তায় বিশ বছর পর্যন্ত জড়িয়ে রয়েছেন। পূর্ব থেকে জ্ঞানার্জন করে নিলে এ ধরনের চিন্তার সমাধান তাঁরা তৎক্ষণাৎ পেয়ে যেতেন। এ থেকে জানা যায়, জ্ঞানার্জনে ব্রতী হওয়ার পদ্ধতিই নির্ভরযোগ্য এবং উদ্দেশ্যের অধিক অনুকূল। আলেমগণ বলেন, সুফী সম্প্রদায় এমন, যেমন কোন ব্যক্তি ফেকাহ শেখে না এবং বলে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফেকাহ শেখেননি। তিনি ওহী ও এলহামের মাধ্যমে ফকীহ হয়েছিলেন। সুতরাং আমিও সদা সর্বদা সাধনা করে করে ফকীহ হয়ে যাব। যে কেউ এরূপ চিন্তা করে, সে নিজের উপর যুলুম করে এবং মূল্যবান জীবন বিনষ্ট করে। অতএব প্রথমে জ্ঞানার্জন ও আলেমগণের বাণীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। এর পর প্রতীক্ষায় থাকবে যে, যা অন্য আলেমগণের জানা নেই, তা যেন সে জেনে নেয়। সম্ভবত সাধনার পরে এটি অর্জিত হয়ে যাবে।

সুফী সম্প্রদায়ের শিক্ষা পদ্ধতি সঠিক হওয়ার প্রমাণ

জানা উচিত, যার অন্তরে সামান্য বিষয়ও এলহামের পথে উন্মোচিত হয়, তাকেই 'আরেফ' (বিভুজ্ঞানী) বলা হবে। আর যার অন্তর কখনও এরূপ অনুভব করে না, তারও এ বিষয়টি বিশ্বাস করা উচিত। কেননা, মারেফত তথা বিভুজ্ঞান মানুষের একটি মজ্জাগত ব্যাপার। এর পক্ষে শরীয়তসম্মত প্রমাণ, অভিজ্ঞতা ও কাহিনী বিদ্যমান আছে। প্রমাণ এই– আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

–যারা আমার পথে সাধনা ও অধ্যবসায় করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে পথ প্রদর্শন করি।

অর্থাৎ কাশফ ও এলহামের পদ্ধতিতে তাদের অন্তর থেকে প্রজ্ঞা প্রকাশ পায়। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন–

من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم ومن لم يعمل بما يعلم تاه فيما يعلم ولم يوفق لعمل حتى يستوجب النار ۔

–যে ব্যক্তি তার এলেম অনুযায়ী আমল করে, আল্লাহ তাআলা তাকে সেই বিষয়ের এলেম দান করেন, যা সে জানে না। তাকে আমল করার তওফীক দেন। ফলে সে জান্নাতের হকদার হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি তার এলেম অনুযায়ী আমল করে না, সে জানা বিষয়ে হয়রান হয় এবং আমল করার তওফীক পায় না। ফলে সে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب

–যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্যে নিষ্কৃতির পথ করে দেন এবং তাকে ধারণাতীত স্থান থেকে রিযিক পৌঁছান।

অর্থাৎ আপত্তি ও সন্দেহ থেকে নিষ্কৃতির পথ করে দেন, জ্ঞান ও মেধা শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা ছাড়াই দান করেন।

আরও বলা হয়েছে ঃ

يايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ۔

–মুমিনগণ, তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ তোমাদেরকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী বিষয় দান করবেন।

এখানে 'ফোরকান' মানে নূর, যদ্দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে সন্দেহ থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। এ কারণেই রসূলে করীম (সাঃ) দোয়ার মধ্যে প্রায়ই এই নূর প্রার্থনা করতেন এবং বলতেন ঃ

اللهم اعطني نورا وزدني نورا واجعل لي في قلبي نورا وفي قبري نورا وفي بصري نورا ۔

–হে আল্লাহ, আমাকে নূর দান করুন, আমার নূর বৃদ্ধি করুন, আমার অন্তরে নূর দিন এবং আমার কবরে ও আমার নয়নে নূর দিন।

এমনকি, তিনি আরও বলতেন ঃ আমার কেশ ও রক্ত-মাংসে এবং অস্থির মধ্যে নূর দান করুন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ۔

–আল্লাহ যার বক্ষ ইসলামের জন্যে উন্মুক্ত করে দেন, সে তার পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে একটি নূরের উপর থাকে।

এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি এরশাদ করেন ঃ এর অর্থ বক্ষের প্রশস্ততা। অর্থাৎ অন্তরে যখন নূর ঢেলে দেয়া হয়, তখন তার জন্যে বক্ষ প্রশস্ত হয়ে যায়। তিনি হযরত ইবনে আব্বাসের জন্যে এই দোয়া করেন–

اللهم فقهه فى الدين وعلمه التاويل

–হে আল্লাহ, তাকে ধর্মীয় বোধশক্তি দান করুন এবং ব্যাখ্যা শিক্ষা দিন।

হযরত আলী রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন কথা গোপনে বলেননি, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোন কোন বান্দাকে কিতাবুল্লাহর জ্ঞান দান করেন। এটা শেখার মাধ্যমে অর্জিত হয় না। يؤتى الحكمة من يشاء –আল্লাহ যাকে ইচ্ছা 'হেকমত' দান করেন– এই আয়াতে কেউ কেউ হেকমতের অর্থ করেছেন আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান। ففهمنها سليمن –আমি সোলায়মানকে তা বুঝিয়ে দিলাম। এখানে কাশফের মাধ্যমে সোলায়মান (আঃ) যা বুঝেছিলেন, তাকেই 'বুঝিয়ে দিলাম' বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন ঃ মুমিন সেই ব্যক্তি, যার দৃষ্টিতে আল্লাহর নূর দ্বারা পর্দার অন্তরালের বস্তু ভেসে উঠে। তিনি কসম খেয়ে বলেন ঃ নির্ঘাত সত্য হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা সত্য বিষয় মুমিনদের অন্তরে ঢেলে দেন এবং মুখে উচ্চারিত করে দেন। হাদীস শরীফে আছে ঃ

اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله تعالى

মুমিনের দূরদর্শিতাকে ভয় কর। কেননা, সে আল্লাহ তা'আলার নূর দ্বারা দৃষ্টিপাত করে।

হযরত ইমাম হাসান (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

العلم علمان فعلم باطن فى القلب فذلك هو العلم النافع .

এলেম দু'প্রকার। এক এলেম অন্তরে লুক্কায়িত। এটাই উপকারী এলেম। জনৈক আলেমকে অন্তরে লুক্কায়িত এলেমের অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ এটা আল্লাহ তা'আলার রহস্যাবলীর অন্যতম, যা

তিনি আপন ওলীদের অন্তরে ঢেলে দেন। কোন ফেরেশতা কিংবা মানুষ তা অবগত নয়। কোরআন শরীফে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, তাকওয়া হেদায়াত ও কাশফের চাবি। এই হেদায়াত ও কাশফকেই শিক্ষা ব্যতীত জ্ঞান বলা হয়। এরশাদ হয়েছে–

هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين

–এটা মানুষের জন্যে বর্ণনা এবং তাকওয়া বিশিষ্টদের জন্যে হেদায়াত ও উপদেশ।

এখানে হেদায়াতের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে তাকওয়া বিশিষ্টদের উল্লেখ করা হয়েছে। আবু ইয়াযীদ বলতেন ঃ আলেম সেই ব্যক্তির নাম নয়, যে কোরআনের কিছু অংশ মুখস্থ করে নেয়, এর পর যখন তা বিস্মৃত হয়, তখন মূর্খ কথিত হয়। বরং আলেম তাকে বলা হয়, যে পরওয়ারদেগারের কাছ থেকে যখন ইচ্ছা পাঠ ও মুখস্থ করা ছাড়া বস্তুনিচয়ের জ্ঞান অর্জন করে নেয়। এরূপ জ্ঞানকেই এলমে রব্বানী বলা হয়। واتينه من لدنا علما (আমি তাকে আমার পক্ষ থেকে এলম দিয়েছি।) আয়াতে এই এলেমের দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। নতুবা সকল এলেমই তাঁর তরফ থেকে। তফাৎ হচ্ছে, কতক জ্ঞান শিক্ষাদানের মাধ্যমে হয়, তাকে 'এলেমে লাদুন্নী' বলা হয় না। বরং যে এলেম বাইরের কোন অভ্যস্ত কারণ ছাড়াই অন্তরে উপস্থিত হয়, তাকেই এলমে লাদুন্নী বলা হয়। এ সম্পর্কে অসংখ্য আয়াত ও হাদীসের মধ্য থেকে এখানে কিঞ্চিত উল্লেখ করা হল।

এখন এ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হচ্ছে, যা অনেক সাহাবী, তাবেঈ ও পরবর্তী বুযুর্গগণের হয়েছে। বর্ণিত আছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে কন্যা আয়েশাকে বললেন ঃ তোমরা দু'ভাই ও দুবোন। অথচ তাঁর পত্নী তখন গর্ভবতী ছিলেন এবং পরে কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিল। এখানে তিনি জন্মের পূর্বেই জেনে নেন যে, কন্যা জন্মগ্রহণ করবে। হযরত ওমর (রাঃ) জুমুআর খোতবার মাঝখানে বলে উঠেন يا سارية الجبل –অর্থাৎ তিনি কাশফের মাধ্যমে জানলেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিম বাহিনীকে শত্রু সৈন্যরা ধাওয়া করছে। তখনই তিনি মুসলিম বাহিনীকে পাহাড়ের দিকে সরে যেতে আহ্বান করলেন। তাঁর এই কণ্ঠস্বর যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের কানে পৌঁছে যাওয়া একটি বড় কারামাত। আনাস ইবনে মালেক বর্ণনা করেন, আমি একদিন হযরত

ওসমান (রাঃ)-এর খেদমতে যাওয়ার জন্যে রওয়ানা হলাম। পথিমধ্যে জনৈকা মহিলাকে পেয়ে আমি তার দিকে তাকালাম এবং তার রূপ গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলাম। এর পর হযরত ওসমানের খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে বললেন ঃ তোমাদের কেউ কেউ আমার কাছে আগমন করে এমতাবস্থায় যে, তার চোখে-মুখে যিনার চিহ্ন থাকে। তোমার কি জানা নেই যে, কুদৃষ্টি করা হচ্ছে চোখের যিনা? তুমি তওবা কর। নতুবা তোমাকে সাজা দেব। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরেও ওহী আগমন করে কি? তিনি বললেন ঃ না, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে জানা যায়। আবু সাঈদ খেরাম বর্ণনা করেন, একবার আমি হেরেম শরীফে গেলাম। সেখানে খেরকা পরিহিত এক ফকীরকে দেখে মনে মনে বললাম ঃ এ ধরনের মানুষই সমাজের উপর বোঝা হয়ে থাকে। ফকীর তৎক্ষণাৎ আমাকে কাছে ডাকল এবং বলল ঃ الله يعلم ما فى انفسكم فاحذروه

–আল্লাহ তোমাদের মনের কথা জানেন। অতএব সাবধান হয়ে যাও।

এতে আমি মনে মনে এস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করলাম। এর পর ফকীর সজোরে বলল ঃ هو الذى يقبل التوبة عن عباده

–তিনি (আল্লাহ) বান্দার তওবা কবুল করেন।

একথা বলে ফকীর আমার দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেল। যাকারিয়া ইবনে দাউদ রেওয়ায়েত করেন, একবার আবুল আব্বাস ইবনে মসরূক অসুস্থ আবুল ফযল হাশেমীকে দেখতে যান। আবুল ফযল ছিলেন ছাপোষা নিঃস্ব ব্যক্তি। জীবন যাপনের জন্যে বাহ্যিক কোন উপকরণ তার ছিল না। আবুল আব্বাস যখন প্রস্থানোদ্যত হলেন, তখন মনে মনে চিন্তা করলেন, ইয়া আল্লাহ! এ লোকটি কোত্থেকে খাবার সংগ্রহ করে? তৎক্ষণাৎ আবুল ফযল তাকে ডেকে বললেন ঃ খবরদার! কখনও এরূপ অনর্থক কথা চিন্তা করো না। আল্লাহ্ তাআলার অদৃশ্য কৃপা অনেক।

আহমদ নকীব বর্ণনা করেন, একদিন আমি হযরত শিবলীর খেদমতে গেলাম। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আহমদ, আল্লাহ তাআলা সকলকে পরিচয়ের জন্যে মস্তিষ্ক দান করেছেন। আমি বললাম ঃ হযরত, ব্যাপার কি, একথা বলছেন কেন? তিনি বললেন ঃ আমি এই মুহূর্তে যখন বসা ছিলাম, তখন আমার মনে ধারণা সৃষ্টি হল যে, তুমি কৃপণ। আহমদ বললেন ঃ হযরত, আমি তো কৃপণ নই। এর পর তিনি

চিন্তা করে বললেন ঃ নিঃসন্দেহে তুমি কৃপণ। অতঃপর আমি মনে মনে সংকল্প করলাম– আজ যা কিছু পাব, তা প্রথমে যে ফকীরের সাথে সাক্ষাৎ হবে, তাকে দান করে দেব। এমনি সময় এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে পঞ্চাশটি আশরফী দিয়ে গেল। আমি এগুলো নিয়ে সংকল্প অনুযায়ী রাস্তায় বের হলাম। এক জায়গায় দেখলাম, জনৈক অন্ধ ফকীর নাপিতের কাছে মাথা মুণ্ডাচ্ছে। আমি তার কাছে যেয়ে আশরফীগুলো দিতে চাইলে সে বলল ঃ নাপিতকে দিয়ে দাও। আমি নাপিতকে দিতে গেলে বলল ঃ এই ফকীর মাথা মুণ্ডাতে বসেছে অবধি আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, কোন মজুরি গ্রহণ করব না। অগত্যা আমি আশরফীগুলো নদীতে নিক্ষেপ করে বললাম ঃ যে কেউ তোদের ইযযত করে, আল্লাহ্ তাকেই লাঞ্ছিত করেন।

হামযা ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, আমি একবার হযরত আবুল খায়রের গৃহে রওয়ানা হলাম এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, তার গৃহে কিছু খাব না। যখন আমি গৃহ থেকে বের হলাম, তখন দেখলাম, তিনি খাদ্যের একটি খাঞ্চা নিয়ে আমার গৃহে আসছেন। তিনি বললেন ঃ নাও, এখন খাও। এটা তো আমার গৃহ নয়। এই বুযুর্গের অনেক প্রসিদ্ধ কারামত আছে। সেমতে ইবরাহীম রকী রেওয়ায়েত করেন, আমি একবার তার সাথে দেখা করতে গেলাম। তিনি মাগরিবের নামায পড়ালেন, কিন্তু সূরা ফাতেহাও ভালরূপে পড়তে পারলেন না। আমি মনে মনে চিন্তা করলাম, তার কাছে আসা সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়েছে। নামাযের পর আমি এস্তেঞ্জার জন্যে বাইরে গেলাম। একটি সিংহ আমার পথ রোধ করে দাঁড়াল। আমি আবুল খায়রের কাছে ফিরে এসে ঘটনা বিবৃত করলে তিনি সেখান থেকেই সিংহকে ভর্ৎসনা করে বললেন ঃ কি হে, আমি কি বলিনি, আমার মেহমানদের কোন অসুবিধা করবে না? একথা শুনেই সিংহ সরে গেল। প্রয়োজন সেরে যখন আমি ফিরে এলাম, তখন তিনি বললেন ঃ তুমি তোমার বাহ্যিক দিকটাকে সোজা করেছ। তাই সিংহকে দেখে ভয় পেয়েছ, কিন্তু আমি আমার বাতেন (অভ্যন্তর) ঠিক করেছি। তাই সিংহ আমাকে ভয় করে। এমনি ধরনের আরও অসংখ্য কাহিনী থেকে মাশায়েখের অন্তর্দৃষ্টি, মানুষের মনের কথা জানা এবং তাদের অন্তরের বিশ্বাস বলে দেয়ার বিষয় অবগত হওয়া যায়। হাঁ, যে অস্বীকার করে, তার জন্যে এসব কাহিনী যথেষ্ট নয়, কিন্তু দু'টি অকাট্য দলীল আছে, যেগুলো কেউ অস্বীকার করতে পারে না। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে অভূতপূর্ব সত্য স্বপ্ন, যদ্দ্বারা অবস্থা উন্মোচিত হয়। কেননা, স্বপ্নে যখন অদৃশ্য জগতের অবস্থা ফুটে উঠা সম্ভবপর হয়, তখন জাগ্রত অবস্থায়

এরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। কেননা, উভয় অবস্থার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, স্বপ্নে ইন্দ্রিয় অচল হয়ে থাকে এবং বাহ্যিক অনুভূত বিষয়সমূহের মধ্যে লিপ্ত হয় না। এটা প্রায়ই জাগ্রত অবস্থায়ও সংঘটিত হয়। যেমন কেউ যখন কোন বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তামগ্ন থাকে, তখন না শুনে কোন আওয়ায এবং না দেখে কোন বস্তু।

দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে অদৃশ্য জগত ও ভবিষ্যত বিষয়াদি সম্পর্কে রসূলে করীম (সাঃ)-এর সংবাদ প্রদান করা। কোরআন ও হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত। এটা যখন নবীর জন্যে প্রমাণিত হল, তখন নবী নয় –এমন ব্যক্তির জন্যেও প্রমাণিত হতে পারে। কেননা, নবী এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যিনি কাশফের মাধ্যমে বিষয়সমূহের স্বরূপ জেনে নেন এবং সংস্কার কাজে মশগুল থাকেন। অতএব এরূপ কোন ব্যক্তি থাকাও সম্ভব, যিনি কাশফের মাধ্যমে বিষয়সমূহের স্বরূপ জানবেন; কিন্তু সংস্কার কাজে মশগুল থাকবেন না। এরূপ ব্যক্তিকে নবী না বলে ওলী বলা হবে। এখন যে ব্যক্তি নবীগণকে মানবে এবং সত্য স্বপ্নের সত্যায়ন করবে, তাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, অন্তরের দু'টি দরজা রয়েছে– একটি বহির্জগত অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়ের দিকে এবং অপরটি উর্ধ্বজগতের দিকে, একেই বলা হয় এলহাম ও ওহী। এ দু'টি দরজা স্বীকার করে নিলে কেউ একথা বলতে পারবে না যে, এলেম কেবল শিক্ষা ও অভ্যস্ত কারণসমূহের মধ্যেই সীমিত।

কুমন্ত্রণার মাধ্যমে অন্তরের উপর শয়তানের প্রভাব বিস্তার

মানুষের অন্তরে একের পর এক যে সকল প্রভাব আসে, ফলে অন্তর পরিবর্তিত হতে থাকে, সেগুলোকে 'খাওয়াতির' বলা হয়। খাওয়াতির থেকে প্রবণতা এবং প্রবণতা থেকে সংকল্প, ইচ্ছা ও নিয়ত গতিশীল হয়। খাওয়াতির দু'প্রকার– শুভ ও অশুভ। অশুভ খাওয়াতিরের পরিণতি ক্ষতিকর হয় এবং শুভ খাওয়াতির দ্বারা আখেরাতে উপকার পাওয়া যায়। শুভ খাওয়াতিরকে এলহাম এবং অশুভ খাওয়াতিরকে ওয়াস্ওয়াসা তথা সন্দেহ, শংকা ও কুমন্ত্রণা বলা হয়। শুভ খাওয়াতিরের মূল কারণ ফেরেশতা এবং অশুভ খাওয়াতিরের মূল উদগাতা শয়তান। ফেরেশতা এমন এক মখলুককে বলা হয়, যাকে আল্লাহ তাআলা কল্যাণ ও জ্ঞান পৌঁছানো, সত্য কাশফ, মঙ্গলের ওয়াদা এবং সৎকাজের আদেশ করার জন্যে সৃষ্টি করেছেন। পক্ষান্তরে শয়তান এমন এক মখলুক, যার কাজ

এর বিপরীত: অর্থাৎ অনিষ্টের ওয়াদা, অশ্লীল কাজের আদেশ এবং দান খয়রাতের সময় দারিদ্র্যের ভয় দেখানো ইত্যাদি। এ থেকে জানা গেল, কুমন্ত্রণার বিপরীত হচ্ছে এলহাম এবং শয়তানের বিপরীত ফেরেশতা। মানুষের অন্তর সদা-সর্বদা এই শয়তান ও ফেরেশতার টানাহেঁচড়ার মধ্যে অবস্থান করে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে ঃ

في القلب لمتان لمة من الملك ايعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم انه من الله سبحانه وليحمد لله ولمة من العدو ايعاد بالشر وتكذيب بالحق ونهى من الخير .

অন্তরে দু'ধরনের উঠানামা হয়। একটি ফেরেশতার তরফ থেকে। তার কাজ হল মঙ্গলের ওয়াদা প্রদান এবং সত্য বিষয়কে সত্য জানা। যে এটা অনুভব করে, তার জানা উচিত, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং তার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। অপর উঠানামা শত্রু অর্থাৎ শয়তানের পক্ষ থেকে। তার কাজ হল অনিষ্টের ওয়াদা দেয়া এবং সত্যকে মিথ্যা মনে করা। যে এটা অনুভব করে, সে যেন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করে।

এর পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ الشيطن يعدكم الفقر ويامر بالفحشاء শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ওয়াদা দেয় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ করে।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন ঃ ইচ্ছা অন্তরের চারপাশে ঘুরাফেরা করে। এক প্রকার ইচ্ছা আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং এক প্রকার শত্রুর পক্ষ থেকে। অতএব আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি রহম করুন, যে ইচ্ছা করার সময় বিরাম দেয়। যদি ইচ্ছাটি আল্লাহর পক্ষ থেকে জানে, তবে তা কার্যকর করে। আর যদি শত্রুর পক্ষ থেকে জানে, তবে তার সাথে যুদ্ধ করে। অন্তরের এই টানাহেঁচড়ার প্রতি নিম্নোক্ত হাদীসে ইশারা করা হয়েছে– قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرحمن মুমিনের অন্তর আল্লাহ্ তাআলার দু'অঙ্গুলির ফাঁকে অবস্থান করে।

কেননা, আল্লাহ্ তাআলা এ বিষয় থেকে মুক্ত ও পবিত্র যে, তাঁর অস্থি ও রক্তমাংসে গঠিত অঙ্গুলি হবে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, মানুষ যেমন অঙ্গুলি দ্বারা দ্রুত কাজ করে এবং অপরের দ্রুততাকে অঙ্গুলি হেলিয়ে ব্যক্ত করে, তেমনি আল্লাহ তাআলা ফেরেশতা ও শয়তানকে কাজে লাগান।

এরা উভয়ই অন্তর পরিবর্তনে মানুষের অঙ্গুলির মতই।

জন্মগতভাবেই অন্তরের মধ্যে ফেরেশতার প্রভাব ও শয়তানের প্রভাব কবুল করার যোগ্যতা সমান সমান। একটির অগ্রাধিকার অপরটির উপর নেই। হাঁ, কামপ্রবৃত্তির অনুসরণ ও বিরোধিতার মাধ্যমে একটি অপরটির উপর প্রবল হয়ে যায়। অর্থাৎ, মানুষ যদি কাম ও ক্রোধের দাবী অনুযায়ী কাজ করে, তবে শয়তান তার উপর প্রবল হয়ে যায়। তখন তার অন্তর শয়তানের আশ্রয়স্থল ও ঠিকানা হয়ে যায়। কেননা, কামপ্রবৃত্তিই শয়তানের বিচরণ ক্ষেত্র। পক্ষান্তরে যদি কেউ কামপ্রবৃত্তিকে পরাভূত করে ফেরেশতাসুলভ চরিত্র অবলম্বন করে, তবে তার অন্তর ফেরেশতাদের মনযিল ও বাসস্থান হয়ে যায়। যেহেতু মানুষের অন্তরে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি সকল প্রবৃত্তি বিদ্যমান আছে, তাই প্রত্যেক অন্তরে শয়তানেরও কুমন্ত্রণা দেয়ার অবকাশ আছে। এ কারণেই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

ما منكم من احد الا وله شيطانة قالوا وانت يا رسول الله قال وانا الا ان الله عافنى عليه فاسلم ولايامر الا بخير -

অর্থাৎ, তোমাদের প্রত্যেকেরই একটি শয়তান আছে। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, আপনারও হে আল্লাহর রসূল? উত্তর হল ঃ আমারও, কিন্তু আমার শয়তান মুসলমান হয়ে গেছে। ফলে ভাল ছাড়া মন্দ আদেশ দেয় না।

বলাবাহুল্য, কামপ্রবৃত্তির মাধ্যমেই শয়তান অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে। অতএব আল্লাহ তাআলা যার প্রতি কৃপা করেন কামপ্রবৃত্তিকে তার এমন অনুগত করে দেন যে, উপযুক্ত সীমা ছাড়া তা প্রকাশ পায় না, তার কামপ্রবৃত্তি তাকে অনিষ্টের দিকে আহ্বান করে না, বরং শয়তান তাকে মঙ্গলের কথা ছাড়া কিছু বলে না। অন্তর যখন আল্লাহর যিকিরে মশগুল হয়, তখন শয়তান সুযোগ পায় না এবং চলে যায়। এ সময় ফেরেশতা তার কাজ করে। অন্তরে ফেরেশতা ও শয়তানের লশকরদের দ্বন্দ্ব সব সময় লেগেই থাকে, যে পর্যন্ত অন্তর এক লশকরের অনুগত না হয়ে যায়। যে লশকর বিজয়ী হয়, অন্তর তারই আবাসস্থল হয়ে যায়। অপর লশকরের আগমন হলেও তা সংঘর্ষের আকারে হয়ে থাকে।

কিন্তু অধিকাংশ অন্তরের অবস্থা হচ্ছে, শয়তানের লশকর তাদেরকে বিজিত ও বশীভূত করে নিয়েছে এবং তাদের মালিক হয়ে বসেছে। এরূপ

অন্তর কুমন্ত্রণায় পরিপূর্ণ। তারা দুনিয়াকে আখেরাতের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে রেখেছে। শয়তানের জোর কম না হওয়া পর্যন্ত এসব অন্তর ফেরেশতার বশীভূত হবে না। শয়তানের জোর কম করার উপায় হচ্ছে, কামপ্রবৃত্তি ও খেয়ালখুশী থেকে অন্তরকে খালি করা এবং আল্লাহ্র যিকির দ্বারা তা পূর্ণ করা। এভাবেই ফেরেশতার প্রভাব অন্তরে নেমে আসে। জাবের ইবনে ওবায়দা আদভী বলেন ঃ আমি আলা ইবনে যিয়াদকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার অন্তরে কুমন্ত্রণা হয় কেন? তিনি বললেন ঃ এটা ঠিক এমন, যেমন এক গৃহে চোর প্রবেশ করল। যদি গৃহে কিছু থাকে, তবে চোর মরিয়া হয়ে তা নিয়ে যাবে। আর যদি কিছু না থাকে, তবে খালি হাতেই চলে যাবে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে অন্তর কামপ্রবৃত্তি ও খেয়ালখুশী থেকে খালি থাকে, তাতে শয়তান প্রবেশ করে না, করলেও খালি হাতে ফিরে যায়। এ কারণেই আল্লাহ বলেন ঃ

ان عبادى ليس لك عليهم سلطن -

অর্থাৎ, (হে শয়তান!) যারা আমার বান্দা, তাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা চলবে না।

সুতরাং যে ব্যক্তি খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে, সে যেন আল্লাহ্র বান্দা নয়। তাকে খেয়ালখুশীর বান্দা বলা দরকার। সেমতে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে– افرأيت من اتخذ الهه هواه দেখ তো, যে ব্যক্তি তার খেয়ালখুশীকে উপাস্য করে নিয়েছে।

এতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, খেয়ালখুশীর অনুসরণকারী খেয়ালখুশীর বান্দা। এরূপ ব্যক্তির উপরই আল্লাহ তাআলা শয়তানকে বিজয়ী করে দেন। শয়তান থেকে আত্মরক্ষার উপায় স্বরূপ হাদীসে আল্লাহর যিকিরই উল্লিখিত হয়েছে। বর্ণিত আছে, হযরত আমর ইবনুল আস রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! শয়তান আমার মধ্যে ও আমার নামাযের মধ্যে আড়াল হয়ে যায়। অর্থাৎ নামায ও কেরাআতের মধ্যে কুমন্ত্রণা দেয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ

ذالك شيطان يقال له خنزب فاذا احسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا -

অর্থাৎ, এই শয়তানকে খানযাব বলা হয়। তুমি যখন একে অনুভব কর, তখন 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম' পাঠ কর এবং বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপ কর।

আমর ইবনে আস বলেন ঃ আমি এই এরশাদ অনুযায়ী আমল করে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা পেলাম। অনুরূপভাবে এক হাদীসে বলা হয়েছে–

ان للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاستعذ بالله منه -

অর্থাৎ, ওযুর মধ্যে কুমন্ত্রণা দেয়ার জন্যে ওলহান নামক এক শয়তান আছে, এর থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর।

আল্লাহ্র যিকির দ্বারা শয়তান বিদূরিত হওয়ার একটি চমৎকার কারণ আছে, তা হচ্ছে, শয়তানী কুমন্ত্রণা অন্তর থেকে তখনই দূর হবে, যখন এই কুমন্ত্রণা ছাড়া অন্য কোন বিষয় অন্তরে উপস্থিত থাকে। কেননা, যিকির যখন অন্তরে স্থান লাভ করবে, তখন এর পূর্বে অন্তরে যা ছিল, তা তাতে থাকবে না। সুতরাং মনকে অন্য কোন বিষয়ে ব্যাপৃত করলে শয়তানী কুমন্ত্রণা দূর হতে পারে। তবে অন্য বিষয়েও কুমন্ত্রণা দেয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়, কিন্তু আল্লাহ্র যিকির ও তৎসম্পর্কিত বিষয়াদির উপস্থিতিতে শয়তানের সাধ্য নেই যে, অন্তরের ধারে-কাছে আসে, কিন্তু শয়তানকে দূর করার ক্ষমতা তাদেরই আছে, যারা মুত্তাকী এবং প্রায়ই যিকিরে মশগুল থাকে। এরূপ লোকদের কাছে অসতর্ক মুহূর্তে শয়তান এলেও গোপনে চলে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطن تذكروا فاذا هم مبصرون -

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা আল্লাহকে ভয় করে, তারা শয়তানের স্পর্শ পেয়েই সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই দিব্যদৃষ্টি লাভ করে। من شر الوسواس الخناس আয়াতের তফসীরে হযরত মুজাহিদ বলেন ঃ শয়তান অন্তরে ছড়িয়ে থাকে। যখন অন্তর আল্লাহর যিকির করে, তখন সে কষ্টে সংকুচিত হয়ে পড়ে। এর পর অন্তর গাফেল হয়ে গেলে শয়তান আবার ছড়িয়ে পড়ে। যিকির ও কুমন্ত্রণা আলো ও অন্ধকারের মত একটি অপরটির বিপরীত। এই বৈপরীত্যের কারণেই আল্লাহ বলেন ঃ استحوذ عليهم الشيطن فانسهم ذكر الله শয়তান তাদের কাবু করে নিয়েছে, অতঃপর আল্লাহর যিকির ভুলিয়ে দিয়েছে। হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

ان الشيطان واضع خرطومه على قلب ابن ادم فان هو ذكر

الله اختس وان نسى الله تعالى التقم قلبه -

অর্থাৎ, শয়তান তার শুঁড় মানুষের অন্তরের উপর স্থাপন করে। যদি মানুষ আল্লাহর যিকির করে, তবে সে সরে যায়। আর যদি আল্লাহকে ভুলে যায়, তবে শয়তান তার অন্তর গ্রাস করে নেয়।

ইবনে আওযা রেওয়ায়েত করেন, মানুষ যখন চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছেও তওবা করে না, তখন শয়তান খুশী হয়ে তার মুখে হাত বুলিয়ে বলে ঃ এ চেহারাটি সাফল্য লাভ করবে না।

মোট কথা, কামপ্রবৃত্তির মানুষের রক্ত-মাংসে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গেছে। ফলে শয়তানের রাজত্বও তার রক্ত-মাংসের মধ্যে বিদ্যমান আছে এবং অন্তরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছে। তাই হাদীসে বলা হয়েছে–

ان الشيطان يجرى من ابن ادم مجرى الدم فضيقوا المجارى بالجوع -

অর্থাৎ, নিশ্চয় শয়তান মানুষের রক্ত চলার পথে চলাচল করে। অতএব তোমরা ক্ষুধার সাহায্যে তার চলাচলের পথ সংকীর্ণ করে দাও।

এরূপ বলার কারণ হচ্ছে, ক্ষুধার কারণে কামপ্রবৃত্তি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ফলে শয়তানের চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। অন্তর যে চতুর্দিক থেকে কামপ্রবৃত্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত, তা এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত–

لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم -

অর্থাৎ, আমি মানুষকে ফাঁদে ফেলার জন্যে তোমার সরল পথে বসে থাকব, এর পর তাদের কাছে আসব সামনে থেকে, পশ্চাৎ থেকে এবং ডান ও বাম দিক থেকে।

নিম্নোক্ত হাদীসেও এ বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে–

ان الشيطان قعد لابن ادم بطرق فقعد له بطريق الاسلام فقال اتسلم وتترك دين ابائك فعصاه اسلم ثم قعد له بطريق الهجرة فقال اتترك ارضك وسماءك فعصاه وهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد للمجاهد فقال هو تلف النفس والمال تقاتل

فتقتل فتنكح نساءك وتقسم مالك فعصاه وجاهد -

অর্থাৎ, শয়তান মানুষের কয়েকটি পথে বসে। সে ইসলামের পথে বসে এবং বলে ঃ তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করে পৈতৃক ধর্ম বিসর্জন দেবে? মানুষ তার কথা না মেনে মুসলমান হয়ে যায়। এর পর শয়তান হিজরতের পথে বসে এবং বলে ঃ তুমি কি হিজরত করে মাতৃভূমি ত্যাগ করবে? মানুষ একথা মানে না এবং হিজরত করে। এর পর শয়তান জেহাদের পথে বসে এবং বলে ঃ যুদ্ধ করার মানে তো জান ও মাল বিনষ্ট করা । তুমি যুদ্ধ করলে নিহত হবে। মানুষ তাও মানে না এবং জেহাদ করে।

এর পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি এভাবে শয়তানের কথা অমান্য করবে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। এর পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) কুমন্ত্রণার কথা উল্লেখ করে বললেন ঃ কুমন্ত্রণা মনের এমন কিছু কল্পনা, যেমন জেহাদকারী ভাবতে থাকে, আমি মারা গেলে আমার স্ত্রী অপরের বিবাহিত হয়ে যাবে। এ ধরনের কল্পনার আসল কারণ শয়তান। এই শয়তান থেকে মানুষের পৃথক হওয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং তার আদেশ অমান্য করাই উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে মানুষের অবস্থা বিভিন্ন রূপ।

এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারে, শয়তান কি বস্তু, সূক্ষ্ম শরীরী কিনা? শরীরী হয়ে মানবদেহে কিরূপে প্রবেশ করে? এ ধরনের প্রশ্ন ঠিক এমন, যেমন কারও কাপড়-চোপড়ে সাপ ঢুকে গেলে সে সাপের অনিষ্ট থেকে মুক্তি লাভের উপায় চিন্তা করে না; বরং প্রশ্ন করতে থাকে, সাপের রঙ ও আকৃতি কিরূপ এবং দৈর্ঘ প্রস্থ কি? এরূপ প্রশ্ন নিছক মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়। উপরোক্ত বর্ণনা থেকে দুশমন তথা শয়তানের অস্তিত্ব তো নিশ্চিতরূপেই জানা গেল। এখন চেষ্টা করা উচিত যাতে এই দুশমন ক্ষতি সাধন করতে না পারে। এ উদ্দেশেই আল্লাহ্ তাআলা কেরআন পাকে অধিকাংশ স্থানে এরশাদ করেছেন, মানুষ শয়তানকে বিশ্বাস করে তার অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করুক। এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

ان الشيطن لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعوا حزبه ليكونوا من اصحب السعير -

অর্থাৎ, নিশ্চয় শয়তান তোমাদের দুশমন। অতএব তাকে দুশমনরূপেই গ্রহণ কর। সে তার দলবলকে আহ্বান করে যাতে তারা জাহান্নামী হয়ে যায়।

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

الم اعهد اليكم يبنى ادم ان لاتعبدوا الشيطن انه لكم عدو مبين -

অর্থাৎ, হে আদম সন্তানরা! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, তোমরা শয়তানের আরাধনা করো না, সে তো তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

অতএব, এ দুশমন থেকে বেঁচে থাকাই মানুষের কর্তব্য। এটা জিজ্ঞেস করা নয় যে, তার বংশ কি এবং বাসস্থান কোথায়? হাঁ, জিজ্ঞেস করার উপযুক্ত বিষয় হচ্ছে, এই দুশমনের হাতিয়ার কি কি? উপরে বর্ণিত হয়েছে, শয়তানের হাতিয়ার হচ্ছে কামপ্রবৃত্তি। আলেমদের জন্য এতটুকু জানাই যথেষ্ট, কিন্তু তার সত্তাকে চেনা এবং ফেরেশতাদের স্বরূপ জানা– এটা আরেফ তথা বিভুজ্ঞানীদের বিষয়, যারা কাশফে ডুবে থাকে।

এখানে জানা দরকার, অন্তরে যে সকল খেয়াল জাগে, সেগুলো তিন প্রকার। এক, যে খেয়াল নিশ্চিতরূপেই কল্যাণের দিকে আহ্বান করে। এগুলো যে এলহাম, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দুই, যে খেয়াল নিশ্চিতরূপেই অনিষ্টের দিকে আহ্বান করে। এগুলো যে কুমন্ত্রণা, তাতে কারও দ্বিমত নেই। তিন, যে খেয়াল মাঝামাঝি। এগুলো ফেরেশতার পক্ষ থেকে, না শয়তানের পক্ষ থেকে, তা জানা যায় না। এতে খুব ধোকা হয় এবং পার্থক্য করা খুব কঠিন। কেননা, কিছু সৎকর্মপরায়ণ লোককে শয়তান প্রকাশ্যভাবে অনিষ্টের দিকে আহ্বান করতে পারে না; বরং অনিষ্টকে কল্যাণের আকৃতি দিয়ে তাদের সামনে পেশ করে। এতে অধিকাংশ লোকের সর্বনাশ হয়ে যায়। উদাহরণতঃ শয়তান আলেমকে উপদেশের ভঙ্গিতে বলে ঃ সাধারণ মানুষের অবস্থা দেখ। সকলেই মূর্খতায় গ্রেফতার, গাফলতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত এবং দোযখের কিনারায় দণ্ডায়মান। তাদের প্রতি রহম করে তাদেরকে সর্বনাশ থেকে বাঁচানো উচিত এবং ওয়ায-নসীহত করা দরকার। আল্লাহ তাআলা তোমাকে এলেমের নেয়ামত, উজ্জ্বল মন-মস্তিষ্ক, চিত্তাকর্ষক বাগ্মিতা এবং সুললিত কণ্ঠস্বর দ্বারা মণ্ডিত করেছেন। এমতাবস্থায় তুমি আল্লাহর নাশোকরী কিরূপে করতে পার এবং জ্ঞান প্রচারে বিরত হয়ে আল্লাহর অসন্তুষ্টির পাত্র হবে কিরূপে? ওয়ায নসীহত করে মানুষকে সৎপথে আনা দরকার। শয়তান এমনিভাবে বুঝিয়ে শুনিয়ে কৌশলে আলেম ব্যক্তিকে ওয়ায করতে সম্মত করে। এর পর তার মনে এই ধারণ সৃষ্টি করে দেয় যে,